৩য় বর্ষ | ১৮৩৭ শক, ১৩২২ সাল, বৈশাখ। | ৮ম সংখ্যা।

আমাদের অধঃপতন।

যে সময় হইতে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে ও দেশবাসীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলাম; সেই সময় হইতে আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন পূজা-বন্দনা নিরত সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলাম। নিজেদের বহুমূল্য সংস্কৃত গ্রন্থরাজিকে কীটদষ্ট পুরাতনযুগজীর্ণ পুঁথি বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় ও নবদ্বীপের ন্যায়দর্শনকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ছাতিরপলা অথবা [illegible] শিখিবার জন্য অন্য দেশে ছুটিয়া চলিলাম। রীতিমত অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে—আমাদের সেই সময় হইতে।

হায় আমরা অবনতির এতদূর নিম্নস্তরে নামিয়াছি যে, পবিত্র ব্রহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অজ্ঞাত কুলশীল পাচকের হস্তে প্রকাশ্য হোটেলে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে দ্বিধামাত্র বোধ করি না।

আমরা নিজ পিতামহের নাম বলিতে হইলে, মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে ঢোক গিলিয়া বিব্রত হইয়া পড়ি; কিন্তু "এলিজাবেথের" পিসতুত ভায়ের নাম এক মুহূর্ত্তে বলিতে

পারি। হায় দুঃখের কথা কি বলিব—আমরা দেশের বিখ্যাত প্রাচীন কবিদের নাম পর্য্যন্ত জানি না—কিন্তু বিদেশের অতি নগণ্য কবির কুল পরিচয় ও কবিতা আমাদের কণ্ঠস্থ।

কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি, তবে আমাদের নিজেদের জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যতদূর পার—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হও—তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তির কারণ নাই, কিন্তু নিজেদের জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পূর্ব্ব-পুরুষদিগের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া বিদেশীর সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কেহ যেন সে শিক্ষায় মনোযোগ না দেন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

হায় ছিল একদিন, যে দিন তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের যজ্ঞধূমাচ্ছন্ন পবিত্র তপোবনে,দেশের নৃপতি পদব্রজে গমন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

ছিল একদিন, যে দিনে এই ব্রাহ্মণ দেবকুল উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থি দান করিয়া, পৃথিবীতে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া অভূতপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ছিল একদিন—যেদিন মণিমরকত-মণ্ডিত পারিষদমণ্ডলী সুশোভিত রাজসভায় ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলে নৃপতি রত্নসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ পদরজ গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনকে সফল জ্ঞান করিতেন। সে দিন আজ অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। তবু প্রাণে আজ যেন একটু আশার সঞ্চার হইতেছে। আজ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে যেন পূর্ব্বগৌরব অনুভব করিতেছেন। এখন আমাদের সর্ব্বগুণা-লঙ্কৃত সংস্কৃতভাষার আদর বাড়িতেছে, আজ আমরা তাম্রপট, স্তূপ, শিলালিপি প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তিসকল মৃত্তিকা খনন করতঃ আবিষ্কার করিয়া বিশেষ আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আজ আমরা আমাদের মাতৃভাষার ও দেবভাষার উন্নতি-কল্পে দেশের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করিতেছি। আজ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক বেশভূষা ছাড়িয়া সামান্য ধুতি চাদর পরিয়া বাহির হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গুরুজনের পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজেকে পবিত্র মনে করিতেছেন, দেবমন্দিরে প্রণাম করিয়া নিজেকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন, আজ গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতে তাঁহাদের কত আগ্রহ। দেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী "ব্রাহ্মণ সম্মিলনী" করিয়া একত্রিত হইতেছেন; কিসে জাতি ধর্ম্ম রক্ষা হইবে, কিসে সমাজের উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে আজ তাঁহারা যথেষ্ট চিন্তা ও কার্য্য করিতেছেন। সমাজের বরপণ মেল-বন্ধন প্রভৃতি কুনিয়মের ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছেন।

গত "ব্রাহ্মণসম্মিলনীর" সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম। কি ব্রাহ্মণ, রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত ও বিদ্যার্থী, ধনী ও নির্ধন প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কত উৎসাহের সহিত উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছেন। কত যুবক, বিনা পণে বিবাহ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। আজ আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ" এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—উত্থান ও পতন স্রষ্টার অভিপ্রেত—তাঁহারই অসীম কৃপা ও সূক্ষ্মনীতির বলে আমাদের ধ্বংসোন্মুখ ব্রাহ্মণজাতি, অধঃপতনের নিম্নসোপান হইতে উন্নতির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশব্যাপী ধর্ম্মানুরাগ

জাগিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় এইটা শুধু ক্ষণিক উত্তেজনা নয়—ইহার ভিতর ঐকান্তিকতা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। আমাদের মেঘান্ধকারাচ্ছন্ন ঝটিকাক্ষুব্ধ দুর্য্যোগের ভীষণ রাত্রি বুঝি পোহাইল, ঐ বুঝি নবারুণ-কিরণরঞ্জিত হইয়া আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আসিতেছে, মর্ম্মের ভিতর আশার তন্ত্রী ঝঙ্কার করিয়া বলিতেছে আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইবে!

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শিবলিঙ্গোৎপত্তি বিবরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বামনপুরাণের ষষ্ঠাধ্যায়ের তাৎপর্য্য—যেমন সর্ব্ববিজয়ী কন্দর্প মহেশ্বরের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া কুসুমশর প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহেশ্বর ও মদনকে প্রহারোদ্যত দেখিয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গম দেবদারুবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মদনও তৎপশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এই দেবদারুবনমধ্যে ঋষিগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা বৃষধ্বজকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। শিব কহিলেন হে ঋষিগণ! আমাকে আমার ইচ্ছামত ভিক্ষা আপনারা দান করুন। ঋষিগণ শিবের ভাব গতিক দেখিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন, তখন শিব সেই পুণ্য আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভার্গব প্রভৃতি ঋষির স্ত্রীগণ মহাদেবকে মনোহর বেশে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কামপীড়িতা হইলেন, কেবল অরুন্ধতী ও অনসূয়া ধৈর্য্যহীনা হয়েন নাই। সেই কাম পীড়িত ঋষিপত্নীগণ উন্মত্ত হইয়া স্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া শিব যে দিকে গমন করিতেছেন; সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ঋষিগণ দেখিলেন করিণীরা যেমন মত্ত করীর অনুগমন করে তাঁহাদের পত্নীগণও সেইরূপ মহেশের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। তখন ভার্গব প্রভৃতি ঋষিগণ সমবেত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, উন্মত্ত দিগম্বরের লিঙ্গ খসিয়া পড়ুক। ঋষিগণের অমোঘ বাক্যে শিবলিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়া ধরণী বিদারণ করতঃ পাতালে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, শিব ও অন্তর্হিত হইলেন। শিবলিঙ্গ পাতাল ভেদ করিয়া আবার ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিতে লাগিল—পৃথিবী কম্পিত হইয়া পড়িল, তখন ব্রহ্মা জগৎ বিক্ষুব্ধ দেখিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। সভক্তি প্রণাম পুরঃসর কহিলেন প্রভো! কি নিমিত্ত অদ্য ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ হইতেছে? বিষ্ণু কহিলেন, ব্রহ্মন্! মহর্ষিগণের শাপে মহাদেবের লিঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে সেই লিঙ্গ ভরেই পৃথিবী বিকম্পিত হইতেছে। ব্রহ্মা বিষ্ণুর মুখে এই অদ্ভুতবাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, জনার্দ্দন! যেখানে লিঙ্গ পতিত হইয়াছে, চল, আমরা সেই স্থানেই গমন করি।

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু সেই স্থানে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন যে শিবলিঙ্গের আদি ও অন্ত নাই। তখন বিষ্ণু অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে লিঙ্গের শেষ সীমা দেখিবার জন্য গরুড়বাহনে পাতালে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বত্রগামী ব্রহ্মাও পদ্মবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে ধাবমান হইলেন, পরন্তু ব্রহ্মা লিঙ্গের শেষ সীমা না পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণুও লিঙ্গের আদ্যন্ত না পাইয়া নিবৃত্ত হইলেন। (এস্থলে স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে একটু বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা শিবলিঙ্গের আদ্যন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না; কিন্তু বিষ্ণু ও দেবগণের নিকট একটু প্রতিপত্তি ও স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সুরভিকে দেবগণের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে অনুরোধ করিয়া দেবগণের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন যে আমি লিঙ্গের শেষ সীমা দর্শন করিয়াছি। সুরভিও ব্রহ্মার অনুকূলে সাক্ষ্যপ্রদান করিলেন ;—কহিলেন যে ব্রহ্মা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য—পরক্ষণেই দৈববাণীর দ্বারায় সুরভি ও ব্রহ্মার বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় দেবতাগণের অভিশাপে গোমাতা সুরভির মুখ অপবিত্র হইল এবং ব্রহ্মার অপূজ্যত্ব হইল। এই বিশেষ স্কন্দপুরাণ ব্যতীত অন্য পুরাণে নাই) তখন পিতামহকে কহিলেন আমরা ত এ লিঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। সুতরাং এক্ষণে সদাশিবের স্তব করা কর্ত্তব্য। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শূলপাণে! তোমাকে নমস্কার, বৃষভধ্বজ! তোমাকে নমস্কার,জীমূতবাহন,তুমি কবি,তুমি সার্ব্ব, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি শঙ্কর, তুমি মহেশ্বর, তুমি ঈশান, তুমি হর, তুমি স্বর্ণাক্ষ, তুমি বৃষাকপি, তুমি দক্ষযজ্ঞ ক্ষয়কর, তুমি কাল, তুমি রুদ্র, তোমাকে নমস্কার। পরমেশ্বর! তুমিই এই জগতের আদি, তুমি এই জগতের মধ্য ও তুমিই এই জগতের অন্ত। বিভো! জগতের সর্ব্বত্রই অবস্থান করিতেছ তোমাকে নমস্কার। সেই দেবদারুবনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে মহেশ্বর সুন্দররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! আমি এক্ষণে ঋষিশাপাভিভূত মদনানলসন্তপ্ত ও নিতান্ত অসুস্থ আছি। দেবগণের অধীশ্বর হইয়াও তোমরা কি নিমিত্ত এ অবস্থায় আমার স্তব করিতেছ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন দেবদেব! আপনার এই যে লিঙ্গটী ভূতলে পতিত হইয়াছে তাহা পুনর্গ্রহণ করুন, আমরা এই প্রার্থনায় স্তব করিতেছি, মহেশ্বর কহিলেন যদি দেবগণ, দানবগণ, মনুষ্যগণ ও ঋষিগণ সকলেই আমার লিঙ্গের পূজা করে তাহা হইলেই আমি এই লিঙ্গ প্রত্যাহরণ করিব—নচেৎ প্রতিগ্রহ করিব না। তাহাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কহিলেন "এবমস্তু" তাহাই হইবে। তখন সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং ব্রহ্মা পূজা করিবার নিমিত্ত কণক পিঙ্গলবর্ণ একটী লিঙ্গ গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি চতুর্ব্বর্ণের নিমিত্ত পৃথক, পৃথক বর্ণের, শিবলিঙ্গের বিধান করিয়া দিলেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ পূজা করিবেন। ব্রহ্মা এই শিবলিঙ্গ পূজার নিমিত্ত চতুর্ভাগে বিভক্ত শাস্ত্রও প্রস্তুত করিলেন। এই শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমাংশের নাম শৈব, দ্বিতীয় অংশের নাম পাশুপত, তৃতীয় অংশের নাম কালবদন, চতুর্থ অংশের নাম কপালিন। বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র স্বয়ং শক্তি, শৈব অর্থাৎ শৈব মতানুসারে শিব-

লিঙ্গোপাসক ছিলেন। তাঁহার শিষ্যের নাম গোপায়ন। তপোধন ভরদ্বাজ মহা পাশুপত ছিলেন। সোমকেশ্বর রাজা ঋষভ তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তপোধন ভগবান আপস্তম্ব কালবদন মতাবলম্বী ছিলেন। ক্রৌথদেশের অধীশ্বর বকনামক বৈশ্য তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ধনদনামক ঋষি কপালিন মতাবলম্বী ছিলেন, কুন্দোদর নামা শূদ্র তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণাবলম্বী শিবমত, ক্ষত্রিয়ের রজোগুণাবলম্বী পাশুপত মত, বৈশ্যের রজস্তমঃসমবায়ানুসারী কালবদনমত এবং শূদ্রের তমোগুণানুসারী কপালিন মত প্রচারিত হইয়াছে। ব্রহ্মা এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের লিঙ্গার্চ্চন বিধান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ভগবান মহেশ্বরও সেই অনন্ত লিঙ্গ সংযত করিয়া লইলেন এবং সেই চিত্র বনে একটী সূক্ষ্মলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক যথাভিলষিত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। *

শ্রীসত্যনারায়ণ সাংখ্যস্মৃতিবেদান্ততীর্থরত্ন।

সাধকের গান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব-ব্যতীত,
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে?
মন অগ্রে শশী বশীভূত—
কর তোমার শক্তিসারে।
আছে কোঠার ভিতর চোরকোঠারী
ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়্দর্শনে তত্ত্ব পেলেম্‌না
আগম নিগম তন্ত্র ঘু'রে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক—
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরমযোগী
যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন
লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে,—
আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গব হাঁড়ি
বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥"

যাঁহার অন্তঃকরণ বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়মিত নহে, যে স্রোতোবাহী ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চালিত হন, তিনি ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না। অন্ধকার গৃহে অভীষ্ট দ্রব্যলাভের ব্যর্থানুসন্ধানের ন্যায় ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল চেষ্টাও বিফল হইয়া থাকে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাঙ্গতিম্॥"

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে

* লেখক শিবলিঙ্গোৎপত্তিসম্বন্ধে যাহা বিবরণ দিয়াছেন, তাহার একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যা প্রকাশ না করিলে সাধারণের এ বিবরণে সবিশেষ শ্রদ্ধা না হইতে পারে, এজন্য আমরা সময়ান্তরে তাহা প্রকাশ করিব। ইতি ব্রাঃ সঃ সঃ।

সে কখনও সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে পারে না।

বাস্তবিক যাঁহারা বিজ্ঞ এবং ভূয়োদর্শনে যাহাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত, লোক সহানুভূতি লাভের ইচ্ছায় যাঁহাদের সঙ্কল্প এবং উদ্দেশ্য বিকৃতিপ্রাপ্ত না হয়, সেই ধনমানাদি নিস্পৃহ সেবকল্প মহাপুরুষগণের আদিষ্ট বিধিনিষেধের অনুবর্ত্তী হইয়া অভীষ্টলাভে যত্ন করা দম্ভাহঙ্কার শূন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্ত্তব্য। রামপ্রসাদও জগদম্বাকে লাভ করিবার উপায় বিশেষের অবতারণা করিবার জন্যই বলিয়াছেন,"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে ইত্যাদি।

"সে যে ভাবের...ধর্ত্তে পারে?"

গমন গ্রহণাদি কার্য্য শারীর শক্তিদ্বারা সম্পাদিত হয়। কোন জড়বস্তু বিষয়ক চিন্তা বা কোন জড় তত্ত্বের উপলব্ধি মানসিক শক্তির কার্য্য। যে শক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি হয় তাহাকে ভাব বলে।

"ভাবেন লভাতে সর্ব্বং ভাবেন দেবদর্শনম্।
ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ ভাবাবলম্বনম্॥"
(রুদ্রযামল)

ভাবের দ্বারা সমস্তই লাভ হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা দেবদর্শন হয়, ভাবদ্বারা পরম জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) লাভ হয়। অতএব ভাবাবলম্বন করিতে হইবে।

"ভাবঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং গূঢ়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়স্থিতম্।"
(রুদ্রযামল)

বুঝিতে পারিলাম—ভাববৃত্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়েই আছে, অর্থাৎ দর্শনস্পর্শনাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ব্যাপারেই ভাবের বিকাশ হইতে পারে। তোমার দৃষ্টিতে ৺ জগন্নাথের মূর্ত্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত অতি কদর্য্য পুত্তলিকামাত্র; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তিনি পরম সুন্দর। তুমি শ্যামামূর্ত্তিতে শিহরিতগাত্রে কঠোরতা ও হিংসার পূর্ণতা দেখ, ভক্ত তাঁহাকে "সৌম্যা সৌম্যতরা, শেষে-সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী" বলিয়া মনে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করেন, তুমিও যাঁহাকে দেখ, ভক্তও তাঁহাকেই দেখেন তবে উপলব্ধি বিষয়ে এত বিভিন্নতা হয় কেন? ভক্ত দেখেন ভাবের আবেশে আর তুমি দেখ শুষ্ক—সংসার মোহে মুগ্ধ হৃদয়ের সহিত।

ভাব তিনপ্রকার। পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব। ভাবের, পক্কতা অপক্কতা ভেদেই এই তিনপ্রকার ভেদ করা হইয়াছে।

"পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধিঃ পশ্বাচারনিরূপণম্।
বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সাক্ষাদ্রুদ্রো ন সংশয়ঃ
দিব্যভাবে দেবতায়া দর্শনং পরিকীর্ত্তিতম্।
বীরভাবে মন্ত্রসিদ্ধিরদ্বৈতাচারলক্ষণম্॥"
(রুদ্রযামল)

পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধি হয়। বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি এবং অদ্বৈতাচার জন্মে। দিব্যভাবে দেবতার দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

"আদৌভাবংপশোঃ প্রাপ্য রাত্রিকর্ম্ম বিবর্জ্জয়েৎ
দিবসে দিবসে স্নানং পূজানিত্যক্রিয়ান্বিতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দমনং দমনং শমনসা চ।
যোগশিক্ষা নিবিষ্টাত্মা ভবেৎ যোগপরায়ণঃ॥
সর্ব্বকালঞ্চ কর্ত্তব্যো যোগঃ সর্ব্বসুখপ্রদঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুর্নিত্যস্তরুণঃ পাতকাপহঃ॥"
(রুদ্রযামল)

সিদ্ধিলাভেচ্ছু ব্যক্তি প্রথম পশুভাব আশ্রয় করিয়া "রাত্রিকর্ম্ম" পরিত্যাগ করিবে। দিবাভাগেই স্নান পূজাদি নিত্য ক্রিয়ান্বিত হইবে। ইন্দ্রিয় সংযম ও যোগশিক্ষা পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা অভীষ্টদায়ক সদ্যঃ পাপনাশক যোগ সাধন করিবে।

"জ্ঞানীভূত্বা পশোর্ভাবে বীরাচারং ততঃপরম্।"
(রুদ্রযামল)

সংযম, নিয়মানুগামিতা ও যোগানুষ্ঠান নামক পশুভাব আয়ত্ত হইলে, যখন চিত্ত বিক্ষেপাবরণ মুক্ত হয়, যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাবল্যহেতু কামগন্ধশূন্য চিত্ত অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্য হয়, তখন সাধক বীরভাব অবলম্বন করিবে। বীরভাবের মূলসূত্র "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ" অর্থাৎ বিকারের কারণ বর্ত্তমানেও যাহাদের চিত্ত বিকৃতি না হয়, যাঁহারা নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় রাজ্যে বিচরণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত না হন, তাঁহারাই বীর। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে—
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

পর্ব্বতাদি হইতে নানারূপে নিস্যন্দিত নদীনদ সমূহ যেমন অচলভাবে অবস্থিত জলরাশি পরিপূরিত সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অবিদ্যাবিজৃম্ভিত সমস্ত কামনা বা বাসনা যাঁহার সেই সমুদ্র স্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা বিলীন হইয়া যায় (কিন্তু তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না) তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন; যিনি কামকামী বিষয়বাসনাপরবশ তিনি কখনও মুক্তি পাইতে পারেন না।

বীরভাবে পঞ্চতত্ত্বাদি দ্বারা কঠোর আত্মপরীক্ষা এবং তৎসঙ্গে অদ্বৈতভাবে "মন্ত্রের সাধন"। যাহারা জ্ঞানযোগী তাঁহাদের পক্ষে অদ্বৈতভাব। ভক্তিযোগীর পক্ষে সেব্য সেবকস্বরূপ দ্বৈতভাব। ইহা অতি গোপনীয় এবং সাধারণ জনগণের অনধিগম্য বলিয়া বিশেষরূপে বিবৃত করা গেল না।

দিব্যভাব বীরভাবের পরিণাম বা চরমোৎকর্ষ।

"দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণং সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূত সমঃক্ষমী॥"
(মহানির্ব্বাণ)

দিব্যভাবাবলম্বী ব্যক্তি দেবতুল্য, সর্ব্বদা শুদ্ধান্তকরণ, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত অনুরাগ বিহীন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং ক্ষমাশীল। এই অবস্থায় অভীষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয়। যিনি জগদম্বাকে লাভ করিতে চান—তাঁহাকে ভাবাবলম্বন করিতে হইবে। কারণ শুষ্ক তর্কাদির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় না, তাঁহাকে লাভ করাত দূরের কথা; তাই প্রসাদ বলিতেছেন 'সে যে ভাবের বিষয়' ইত্যাদি। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানাবিষ্টচেতা যে সকলব্যক্তি আজকাল বেদ উপনিষদাদি ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তাহাদের যুক্তিতর্কাদিতে যে কেবল জড়তত্ত্বানুসন্ধিৎসা এবং জড় বিষয়ক জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার কারণ যে বৃত্তিদ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রবেশ লাভ হয়, সেই বৃত্তিটীর—সেই ভাব বৃত্তিটীর—অত্যন্তাভাব বলিতেপারি কি ?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পশ্বাচারী সাধক অর্থাৎ যিনি সাধনমার্গে নূতন প্রবিষ্ট—তিনি যোগী হইবেন—সর্ব্বদা যোগানুষ্ঠান করিবেন। যোগের মধ্যে স্থূল কল্পে দুই প্রকার ভেদ আছে; এক আত্মযোগ, দ্বিতীয় ঈশ্বরযোগ। নিজে নিজের অন্নময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে সমাধি লাভের পর আত্মাতে মন বিলীন হইলে সেই যোগের নাম আত্মযোগ। আর ঈশ্বরের স্থূলাবস্থা অবধি সূক্ষ্মাবস্থা পর্য্যন্ত সমাধি করিয়া যে ক্রমে আত্মার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়—তাহার নাম ঈশ্বর-

যোগ। আত্মযোগী হইতে ঈশ্বরযোগী শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার যোগীর মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরগতপ্রাণ অর্থাৎ ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, তাঁহারাই—সেই পরম ভক্ত ঈশ্বরযোগীরাই আমার (ঈশ্বরের) বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম। রামপ্রসাদ ভক্তিরসের রসিক ছিলেন, এই সঙ্গীতে তিনি ভক্তির-সাত্মক ঈশ্বর যোগের অবতারণা করিয়াছেন।

"মন অগ্রে……ভোর হলে সে লুকাবেরে।"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

"নাড়ীনামপি সর্ব্বাসাং মুখ্যা গার্গি চতুর্দ্দশ।
তাসাং মুখ্যতমাস্তিস্রস্তিসৃষ্বেকোত্তমোত্তমা॥
মুক্তিমার্গেতু সা প্রোক্তা সুষুম্না বিশ্বধারিণী।
ইড়াচ পিঙ্গলাচৈব তস্যাঃ সব্যেচ দক্ষিণে॥
ইড়া তস্যাঃস্থিতা সব্যে পিঙ্গলাচৈব দক্ষিণে।
ইড়ায়াং পিঙ্গলায়াঞ্চ চরতশ্চন্দ্রভাস্করৌ॥
ইড়ায়াং চন্দ্রমাঃ জ্ঞেয়ঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ॥
চন্দ্রস্তামস ইত্যুক্তঃ সূর্য্যোরাজস উচ্যতে॥"

হে গার্গি! সমস্ত নাড়ীর মধ্যে চতুর্দ্দশ-টীই প্রধান এই চতুর্দ্দশটীর মধ্যে তিনটী মুখ্যতমা; ঐ তিনটীর মধ্যে আবার একটী সর্ব্বোত্তমা, তাহার নাম সুষুম্না। তাহার বামদিকে ইড়া এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা। ইড়ার মধ্যে চন্দ্র এবং পিঙ্গলার মধ্যে সূর্য্য বিচরণ করেন। চন্দ্র তমোগুণাত্মক এবং সূর্য্য রজোগুণাত্মক। ব্যাখ্যায়মান গানের পূর্ব্বোক্ত চরণদ্বয়ের মধ্যে শশী, অর্থ—ইড়াসঞ্চারী তমো-গুণাত্মক চন্দ্র অর্থাৎ তামসিকবৃত্তিসমূহ। কোঠা শরীর, এবং চোরকোঠারী ইড়া নাড়ী। ইহার অর্থ—যোগাধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ ইড়াসঞ্চারী চন্দ্রকে অর্থাৎ সমস্ত তামসিক বৃত্তিগুলি বশী-ভূত অর্থাৎ আয়ত্ত (জয়) কর, তোমার জীবনশর্ব্বরী প্রভাত হইলে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে সেই চোর কোঠারীতে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে সে গুলি লীন হইয়া যাইবে। যোগতত্ত্ব অতিগুহ্য অথচ দুর্জ্ঞেয়, তোমার আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তবে এইমাত্র বুঝিতে পারি যে যোগীর পক্ষে সর্ব্বপ্রথমই আবরণা-ত্মক তামসিক বৃত্তিগুলি জয় করা একান্ত প্রয়োজন। তমোগুণ জিত না হইলে প্রকৃত রূপে চেষ্টাই আরব্ধ হইতে পারে না।

"ষড়্দর্শনে………বিরাজকরে পুরে।"

গীতায় ভগবদ্ বাক্য—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

অর্থাৎ তুমি আমার যেরূপ দর্শন করিলে এইরূপ কেবল চতুর্ব্বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, দান কিম্বা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞদ্বারা মানব দর্শন করিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! কেবল মাত্র অনন্য অর্থাৎ মদেকনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে, প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং আমাতেই নিবিষ্ট বা বিলীন হইতে পারে। রাম প্রসাদও অন্যত্র বলিয়াছেন—

"বেদে দিলে চক্ষে ধূলা,
ষড়্দর্শনে সেই অন্ধগুলা,
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠামুলা,
খেলা ধুলা কে ভাঙ্গিল।"

বাস্তবিক দর্শনাদি শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ বাদী—কেহ ঈশ্বরকে সগুণ সক্রিয় বলেন,

কেহ বলেন—নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন—কেহ করেন না। এইরূপ বিরুদ্ধমতের কারণ এই যে—যুক্তি তর্কাদি দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণযোগ্য নহে। চিনির মিষ্টতা অনুভববেদ্য, যুক্তিদ্বারা বুঝাইবার নহে। ভক্ত বলিয়াছেন—"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" বিশ্বাসী ভক্তের নিকট পরমেশ্বর নিত্য সিদ্ধ প্রত্যক্ষ বস্তু, কিন্তু কূটতর্কী পাণ্ডিত্যাভিমানী অবিশ্বাসীর নিকট তাঁহার সত্তারই অভাব। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন,—সেই আমার চিরাধেয় বিত্তের অনুসন্ধানে আগম, নিগম ও দর্শনাদি শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিলাম, কিন্তু এই সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাঁহার সুমীমাংসিত অতর্ক্য স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলাম না। কিন্তু এখন বুঝিয়াছি—তিনি আমার অন্তরেই আছেন। আরও বুঝিয়াছি—তিনি "ভক্তিরসের রসিক।" ভক্তিতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় ও প্রত্যক্ষ করা যায়। কস্তূরিকা মৃগ স্বীয় নাভিকমলস্থ কস্তুরীর গন্ধে উন্মত্ত হইয়া—কোথা হইতে সে গন্ধ আসিতেছে—স্থির করিতে না পারিয়া তাহা পাইবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, অজ্ঞ মানবও হৃদয়বিহারী জগজ্জীবনকে নিজহৃদয়ে সন্ধান না করিয়া বাহিরে খুঁজিয়া বেড়ায়। সাধনমার্গে উন্নতিশীল ব্যক্তি এ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। রামপ্রসাদ অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"মা আমার অন্তরে আছ,
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।"

তিনি যে কেবল ভক্তিসুলভ—তাহা আমরা ভগবানের বাক্যেই বুঝিতে পারি—
"ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

"সে ভাব লোভে .....চুম্বকে ধরে।"

যে ভাগ্যবান্ মহাপুরুষে ভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে—তিনি সর্ব্বভূতে মৈত্রী এবং করুণাসম্পন্ন। সুখ, দুঃখ, মান, অপমান এবং নিন্দা স্তুতিতে সমজ্ঞানী। তিনি হর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ পরিশূন্য। অতএব ভক্ত হওয়া সহজ কথা নহে। রামপ্রসাদ বলিতেছেন "সেই পরম দুর্লভ ভাব লাভ করিবার জন্য যোগী যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া যোগসাধন করিয়া থাকেন, চুম্বক যেমন কর্দ্দমাদি পরিশূন্য লৌহকে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করে, ঈশ্বর ও সেইরূপ নির্ম্মলচেতা ভক্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন।" দৃষ্টান্তটী অতি সুন্দর। লৌহকে আকর্ষণ করা চুম্বকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিন্তু সেই লৌহ কর্দ্দমাক্ত থাকিলে চুম্বকের আকর্ষণ বিফল হয়—অর্থাৎ কর্দ্দমাক্ত লৌহ চুম্বকের আকর্ষণ সত্ত্বেও তাহাতে যাইয়া সংলগ্ন হইতে পারে না, কর্দ্দমপরিশূন্য হইলে তাহাতে সংলগ্ন হয়। ঈশ্বরও জীবকে সততই তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত মায়ার আবরণ থাকে সে পর্য্যন্ত জীব তাঁহার আকর্ষণ সত্ত্বেও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। কর্দ্দমশূন্য লৌহের ন্যায় জীব যখন মায়ামুক্ত হয় তখনই প্রাণে প্রাণে তাঁহার আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে এবং ক্রমে তাহাতে যাইয়া সংলগ্ন হয়।

ভক্তি এবং জ্ঞানের প্রবলাবস্থায় মায়ার আবরণ ঘুচিয়া যায়। জ্ঞানী ঈশ্বরেতে নিজের অস্তিত্বটা ঢালিয়া দেন—ঈশ্বরে মিলাইয়া যান। আর ভক্ত তাঁহার সমীপে থাকিয়া সখ্য মধুরাদি ভাবে তাঁহার উপাসনাতে বিমলানন্দ অনুভব করেন।

"প্রসাদ বলে.........মন ঠারে ঠোরে"

সাগরে যাইতে হইলে জাহাজ নৌকা প্রভৃতির সাহায্যে যাইতে হয়, ঈশ্বরকে

লাভ করিতে চান—যিনি সেই অমৃত সাগরে যাইতে অভিলাষী তাঁহাকে দাস্য সখ্যাদি কোন একটী ভাব অবলম্বন করিতে হইবে, নতুবা নহে। ঈশ্বর পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন, তিনি কাহারও পিতাও নহেন মাতাও নহেন, অথচ তিনি সকল রূপেই বিরাজমান অর্থাৎ তাঁহাকে যে যে ভাবে চায় সে সেই ভাবেই পায়। জলের নির্দ্দিষ্ট কোন আকৃতি নাই অথচ সর্ব্বপ্রকার আকৃতিই আছে, যে পাত্রে রাখা যায় তাহারই আকার ধারণ করে। ঈশ্বরকে যে যেভাবে চায় সে সেই ভাবেই পায়। প্রসাদ বলিতেছেন "মন! আমি যে মাতৃভাবে কাহাকে পাইতে চাই—তাহা কি আর ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে? অর্থাৎ আমি যে সেই দ্বেষ্যপ্রিয়পরিশূন্য ভূমা জগৎপতিকে মাতৃভাবে পাইতে চাই তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?" এখানে বলা আবশ্যক যে দাস্য সখ্যাদি সেব্যসেবকাত্মক ভাবগুলিও পশুভাবে এবং বীরভাবের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা উক্ত ভাবদ্বয়ের একতরের অবলম্বনে অদ্বৈতাচারমূলক জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ভক্তিপথের পথিক হন—তাঁহারা সেব্যসেবকাত্মক এই ভাবগুলির কোন একটীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দিব্যভাব বীরভাবের পরিণতি বা চরমোৎকর্ষ।

"কেবল আশার আশা
ভবে আসামাত্র সার হ'ল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে প'ড়ে ভ্রমর
ডুবে র'ল॥
মা, নিম খাওয়া'লে চিনি ব'লে
কথায় ক'রে ছল।
এখন মিঠার লোভে তিতমুখে সারাদিনটা গেল
মা, খেলবে ব'লে ফাঁকি দিয়ে নামালে
ভূতল। এবার যে খেলা খেলিলে মাগো—
আশা না মিটিল॥
প্রসাদ বলে ভবের খেলা যা হবার হ'ল।
এখন সন্ধ্যা বেলা কোলের
ছেলে ঘরে নিয়ে চল॥"

"কেবল আশার ....সার হ'ল।"

যাহার আশায় এ সংসারে বারম্বার আসা যাওয়া করিতেছি, যাহাকে পাইবার জন্য অনন্তকাল হইতে এই মহা আবর্ত্তনে ব্রতী হইয়াছি—তাহাকে পাইলাম কৈ? কেবল যে আশার ছলনায়ই মুগ্ধ হইয়া রহিলাম। শুনিয়াছি,—

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি,
অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং তদ্দুঃখমিতি"।

যিনি অনন্ত তিনিই সুখস্বরূপ, তুচ্ছ বিষয়ানুসরণে সুখ নাই। সুখানুকৃতি যে বিষয়সমূহে সুখের আধার বলিয়া বিবেচনা করি সেই সমস্তই বিনাশশালী ক্ষণস্থায়ী, সে সমস্তই দুঃখের স্বরূপ। হায় মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন চিত্রিত পদ্ম হইতে মধুলাভের প্রত্যাশায় ব্যর্থশ্রম করে—বারম্বার বিফল মনোরথ হইয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না প্রত্যুত তাহাতেই মিলিয়া থাকে—সেইরূপ অমিতসুখস্বরূপিণী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় ব্যর্থ বিষয়সুখে মগ্ন হইয়া আছি। বারম্বার প্রতারিত হইয়াও—সর্ব্বদা অতৃপ্তি, অশান্তিতে দন্দহ্যমান হইয়াও তাঁহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তৃষ্ণা-সূচী-বিনির্ভিন্নং মিশ্রং বিষয়-সর্পিষা।
রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্॥
কুলার্ণবতন্ত্রে।

তৃষ্ণারূপ সূচীদ্বারা ছিন্নভিন্ন, বিষয়রূপ ঘৃত মিশ্রিত, অনুরাগ এবং বিদ্বেষরূপ অগ্নিতে পচ্যমান মানবকে মৃত্যু গ্রাস করিয়া থাকে। বাস্তবিক আমরা সুখতৃষ্ণায় পথভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বদা বিষয় রাজ্যে বিচরণ করি, এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া জীবনও অশান্তিময় করিয়া তুলি, ইত্যবসরে মৃত্যু আসিয়া অলক্ষিত ভাবে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

"মা নিম খাওয়ালে——সারা দিনটা গেল।"

গৃহকার্য্যে ব্যতিব্যস্তা জননী উৎসঙ্গাভিলাষী সন্তানকে মিষ্ট জিনিষ দিয়া ভুলাইয়া রাখেন, তোমার কোলে যাইবার জন্য সমুৎসুক এ হতভাগাকেও তুমি সেইরূপ করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছ। আমার প্রাণ চায়—তোমাকে, কিন্তু পাষাণী তুমি—তুচ্ছ বিষয় সুখে আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়া নির্ম্মম হইয়া আছ, আর আমি হতভাগা সুখের আশায়—সুখস্বরূপিণী তোমাকে পাইবার জন্য পথভ্রষ্ট হইয়া পাপের পিচ্ছিলবর্ত্মে আছাড় খাইতেছি। তোমার ছলনায় মিঠার লোভে নিম খাওয়া সারা জীবনটা তিক্ত রসাস্বাদনেই যাপন করিতে বসিয়াছি।

"মা, খেলবে বলে——আশা না পূরিল।"

সেই একদিন ছিল—যখন আমিত্বপরিশূন্য আমি তোমারই ক্রোড়ে সুখসুপ্ত ছিলাম খেলার ছল দিয়া আমাকে ভূতলে নামাইয়াছ—তোমা হইতে পৃথক্ সত্তার অনুভূতি দিয়া আমাকে সংসারী করিয়াছ; কিন্তু মা, এখেলায় ও আশা মিটিল না। প্রাণের সেই উৎকট পিপাসার ত নিবৃত্তি হইল না। বুঝিতে পারিলাম—তোমাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রের অতুল ঐশ্বর্য্যও শান্তি নাই—আর তোমাকে লইয়া তোমার ক্রোড়ে থাকিয়া শাকান্নে দিনপাত করা ও মহাসুখ, কারণ তুমিই ত সুখ স্বরূপিণী।

"প্রসাদ বলে————ঘরে নিয়ে চল।"

মা, ভবের খেলায় সুখ হইল না, তোমাকে ছাড়িয়া সংসারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি মাত্র। এখন এ বৃদ্ধ বয়সের নিরানন্দময় জীবনসন্ধ্যায় আজীবন মুগ্ধকরী আশার আলোকছটা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। এখন নৈরাশ্যের অন্ধকার—মৃত্যুর করালচ্ছায়ার সহিত একীভূত হইয়া হৃদয় রাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর ছলনা করিয়া ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া থাকিও না। যাহাদের সঙ্গে খেলিয়াছি একে একে তাহারা সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আর কেন? এখন সন্ধ্যাবেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল। প্রবৃত্তির পথে সুখ নাই একথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি—ভোগের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে মা! প্রবৃত্তির পথ হইতে সরিয়া যাই এমন শক্তি আমায় নাই। আমাকে তুমি কোলে তুলিয়া না লইলে—আমি যাইতে পারিব না। তাই বলি মা! এখন সন্ধ্যাবেলা কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিকিশোর আগমবাগীশ।

ব্রহ্ম-জ্ঞান।

এই যে ধনধান্যপূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে। আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী—ব্রহ্ম দ্বারা ইহা বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সুবর্ণময় অলঙ্কারের বাহিরে ও ভিতরে যেরূপ সুবর্ণ ব্যতীত আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত এই জাগতিক পদার্থের কোন অস্তিত্ব নাই, আত্মা ও ব্রহ্ম এক সুতরাং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন—ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন। যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সর্ব্বভূতের বিনাশে অবিনাশী বলিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার এই জ্ঞানই যথার্থ ব্রহ্ম জ্ঞান। একই চন্দ্র যেরূপ বিভিন্ন জলাধারে পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, সেই রূপ একই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিতি করিয়া, এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশ পান, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকে সর্ব্বত্রই একরূপে দর্শন করেন, ইহাই প্রকৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান। ব্রহ্মই জীব রূপে সর্ব্ববস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত জগৎ যথানিয়মে শাসিত ও পরিচালিত করিতেছেন, সর্ব্বাত্মরূপী পরমেশ্বর দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আচ্ছাদিত—সর্ব্বত্র পরমেশ্বর সত্তামাত্র বর্ত্তমান। পরব্রহ্মের সংকল্প প্রসূত স্থাবর জঙ্গমময় এই জগৎ বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও পরব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত—ব্রহ্মের সত্বাই জগতের সত্বা, আত্মাই সমস্ত জগৎ এবং সমস্তজগতই আত্মরূপ, একমাত্র আত্মার সত্ত্বাবেই দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম সর্ব্বজগতের অন্তর ও বাহিরে বর্ত্তমান, তিনি চল ও নিশ্চল, তিনি অনৈশ্বর্য্য হইয়াও ঐশ্বর্য্যবান্, অণিমা, লঘিমা প্রাপ্তি, প্রকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা, তাঁহার ঐশ্বর্য্য। অণিমা পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মতা লাভের ক্ষমতা। লঘিমা তুলার ন্যায় লঘু হইবার শক্তি। প্রাপ্তি—এক স্থানে থাকিয়া অন্যস্থানের বস্তুকেও হস্তদ্বারা পাইবার ক্ষমতা। প্রকাম্য—ইচ্ছামত বিষয় পাইবার শক্তি। মহিমা—পর্ব্বতাদির ন্যায় বৃহত্তরতা লাভের ক্ষমতা। ঈশিত্ব—সকলকে নিজের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা। বশিত্ব—ভূত, ভৌতিক সমস্ত পদার্থকে নিজের বশে রাখিবার শক্তি। কামাবসায়িতা -সর্ব্বত্রইচ্ছার অব্যাহত গতি। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জ্ঞানী যোগীর এই ভগবৎ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। "যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

(কেনোপনিষৎ)

ব্রহ্মবিজ্ঞান চৈতন্য ও আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম কেবলই বিজ্ঞানময়। ব্রহ্ম- সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞান স্বরূপ। ঊর্ণনাভ যেরূপ অপর কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়া আপনিই জালরাশি সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ সেসমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে, পৃথিবীতে যেরূপ ঔষধি সমূহ প্রাদুর্ভূত হয়, এবং জীবৎপুরুষ দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোমসমূহ—সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই সংসারে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ

জীবোপভোগ্যা অব্যাকৃতি প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতে প্রাণ হিরণ্য গর্ভ, হিরণ্য গর্ভ হইতে মন (অন্তঃকরণ) তাহা হইতে সত্য নামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত—তাহা হইতে পৃথিব্যাদি লোক সমূহ (লোকেতে আবার কর্ম্ম) এবং শুভকর্ম্মে আবার অমৃত, অর্থাৎ কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হয়। সেই অক্ষয়পুরুষ পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ এবং তাহা হইতেই বিবিধ পদার্থ সমূহ সমুৎপন্ন ও তাহাতে বিলীন হয়—সেই অক্ষয় পুরুষ দিব্য, মূর্ত্তিমান্। "লীলা ও ক্রিয়া ভেদে মূর্ত্তিমান" তিনি অজ (জন্মরহিত) প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষয়পদবাচ্য—অব্যক্ত হইতেও পর। দ্যুলোক তাঁহার মস্তক; চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক শ্রোত্রদ্বয়, বেদসমূহ বাগ্ বিস্তার (বাগিন্দ্রিয়) বায়ু প্রাণস্বরূপ এবং সমস্তজগৎ তাঁহার অন্তঃকরণ, আর পৃথিবী তাঁহার পাদদ্বয় হইতে জাত, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। ব্রহ্মজ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ। রজ্জুতে যেরূপ ভ্রমাত্মক সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, জাগতিক সর্ব্ববিধ আব্রহ্মবুদ্ধিও তদ্রূপ। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য পদার্থ, ইহাই বেদের উপদেশ। ব্রহ্ম মহৎ, অলৌকিক ও অচিন্ত্যস্বরূপ। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, এবং দূর হইতে দূরবর্ত্তী, অথচ সমীপেতে প্রকাশমান। বিশেষতঃ দর্শনক্ষম চেতনপদার্থে তিনি এই শরীরেই, গুহাতে, হৃদ্‌পদ্মে, নিহিত আছেন। ব্রহ্ম সত্য ধর্ম্মে পরিব্যাপ্ত—এই কারণে বৃহৎ মহৎ দিব্য স্বপ্রকাশ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্যরূপ, স্থূল, সূক্ষ্ম সর্ব্ববস্তুরই কারণ। তিনি আদিত্য চন্দ্রাদির আকারে নানা ভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।

অজ্ঞানীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অগম্য, এইব্রহ্ম দূর হইতে দূরে অথচ সমীপে,—কারণ তিনি জ্ঞানিগণের আত্মস্বরূপ, আত্মা অপেক্ষা নিকটে আর কেহ নাই। জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, ধ্যান যোগে আত্মদর্শন ঘটে। সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগদাশ্রয়ী ভূত ব্রহ্মকে জানেন যে—ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া এই জগত প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার পর লোকের, বিশ্বাস ও তদুপযোগী ক্রিয়া অনুষ্ঠান এবং জীবের ব্রহ্মভাবে নিশ্চয় ও তদনুসারে যে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ, ইহাই জীবের যমযাতনা নিবৃত্তির এবং পরমশ্রেয়ের—মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। জীব যতকাল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ থাকে, ততকাল স্বর্গাদি সুখ সম্ভোগ সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের আশা থাকে না। আত্মা যে জড় দেহ হইতে পৃথক—তাহা হৃদয়ঙ্গমের নামই বিবেক এবং ইহাই মোক্ষ লাভের প্রধান সহায়। এই ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে শরীর পাতের পূর্ব্বেই সেই জ্ঞানিজন সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। এবং অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন আর যাঁহার এই জ্ঞান না জন্মে তিনি ঐ ফলে স্বর্গাদি ভোগস্থানে শরীর লাভের অধিকারী হন। অথচ ইহলোকে শরীরপাতের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্মকে বুঝিতে শক্ত না হন, তাহা হইলে বিবিধলোকে শরীর লাভ হয়, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী অলিঙ্গ (সর্ব্বপ্রকার চিহ্নবর্জ্জিত) পুরুষ (পরমাত্মা) অব্যক্ত অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ। চক্ষুরাদি (ইন্দ্রিয়) দ্বারা এই আত্মদর্শন উপলব্ধি হয় না। যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাভিমুখে অবস্থিতি করে, তখনই তাহার ব্রহ্ম দর্শন হয়—তখনই তিনি দেখিতে পান—যে

সহবর্ত্তী ও সমানস্বভাব জীবাত্মা ও পরমাত্মা জীবদেহে সংযুক্ত রহিয়াছে। জীব স্বাদু কর্ম্ম-ফল ভোগ করেন, আর পরমাত্মা ভোগ না করিয়া দর্শন মাত্র করেন জ্ঞানী সাধক তখন পাপপুণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লেপ হইয়া ব্রহ্মের সহিত নিরতিশয় সাম্য (অভেদ-ভাব) প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতস্থ প্রাণের প্রাণ স্বরূপ, তিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন, তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও জ্ঞান ধ্যানাদি-ক্রিয়াবান্, তিনি আত্ম-ক্রীড়, আত্মরতি।

নারিকেল ফলের 'অন্তর্ব্বর্ত্তী বীজ যেমন বাহ্যদলসমূহে আবৃত থাকে, সেই রূপ ব্রহ্ম ও জাগতিক আবরণে আবৃত, পরব্রহ্ম প্রকৃত্যাশ্রিত হইয়া রজোগুণাবলম্বনে স্বয়ং ব্রহ্মা উপাধিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সত্ত্বগুণাবলম্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট সকলকে পালন করেন এবং তমোগুণাবলম্বনে অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন। ঐ একমাত্র পরব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণ জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি স্রষ্ট' হইয়া আপনাকে সৃজন করেন, পালকও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং পরিশেষে সংহর্ত্তা ও সংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন। ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষরস্বরূপ ঐরূপদ্বয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। অক্ষর পরম ব্রহ্ম, ক্ষর এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মের রূপান্তরমাত্র,—ব্রহ্মেরই শক্তি। দেবগণ অপেক্ষাকৃত ন্যূন শক্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি মনুষ্য, পশু পক্ষিপ্রভৃতি ন্যূনতর শক্তি। অবিদ্যা আবরণের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা উপলব্ধি হয় মাত্র। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—পরম ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মেরই শ্রেষ্ঠ মূর্ত্ত, ঘনীভূত ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ। ঐ একই ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিমূর্ত্তিতেই এক মূর্ত্তি। এই সগুণ বা কারণ ব্রহ্মে এই ব্রহ্মাণ্ড ওতঃপ্রোত অর্থাৎ বস্ত্রে তন্তুর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত, তাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন ও তাহাতে অবস্থিত এবং তিনিই এই জগৎ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর লীলা ও কার্য্যাদির জন্য প্রয়োজনানুরূপ গুণ আশ্রয় করিয়া কার্য্য ও লীলামাত্র প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ ইঁহাদের কোন গুণভেদ নাই। ইঁহারা সর্ব্বগুণময় অথচ সর্ব্বগুণাতীত পর-ব্রহ্মেরই রূপ। কেবল কার্য্যানুরোধে প্রয়োজনানুরূপগুণাবলম্বনে একে ত্রিরূপ ত্রিমূর্ত্তি; প্রত্যুত কোন ভেদ নাই। যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন, যিনি ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং যাহাতে লয়-প্রাপ্ত হয়; সেই ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—একরূপে বিষ্ণু বা মহেশ্বরই পরম ব্রহ্ম। সেই শ্রুতি প্রতিপাদ্য বা প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বিষ্ণু বা মহেশ্বর, বিষ্ণুই সদসতের পরমপদ। বিষ্ণু হইতেই সমস্ত এই চরাচর জগৎ অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুও পরমব্রহ্মের লক্ষণে ভেদ নাই। বিষ্ণুই মূলপ্রকৃতি, তিনিই ব্যক্ত-রূপী ব্রহ্মাণ্ড। এই সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত—তাঁহাতেই লীন হয়। তিনিই ক্রিয়া, তিনিই সকলের কর্ত্তা, তিনিই যজ্ঞরূপে যজ্ঞেশ্বর।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম একেরই দুইটী ভাব মাত্র। বিষ্ণু সগুণ এবং তিনিই নির্গুণ, নির্গুণ ব্রহ্ম সৃষ্টি ও লীলাবশে গুণ এবং ক্রিয়াযুক্ত হন।

> সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
> গুণোর্ম্মি সৃষ্টি স্থিতি কাল সংলয়ঃ
>
> বিষ্ণু পুরাণ ১১ ২

যিনি প্রকৃতির ক্ষোভ হইতে জাত, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুভূত পুরুষ ঈশ্বর—তিনিই ২৫ অক্ষর ব্রহ্ম।

পর ব্রহ্মই মায়া উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ ব্রহ্ম হন। নির্গুণ ও সগুণ যে একই বস্তু;—শাস্ত্র তাহাই প্রতিপাদন করেন,—

"সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ—"

নির্গুণ ব্রহ্ম লীলাবশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ। ভাগবত ৩৭।২

অনন্তসমুদ্রের যে প্রশান্ত অবস্থা ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরী সঙ্কুল বীচি বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত কখন বীচি বিক্ষুব্ধ তাই একই ব্রহ্ম কখন সগুণ কখন বা নির্গুণ একই ব্রহ্মের এই দুই বিভাব। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই তিন ভাবে একই ব্রহ্ম,—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা সত্ত্বগুণপ্রধান, পালন কার্য্যে বিষ্ণু রজোগুণপ্রধান, সংহার কার্য্যে মহেশ্বর তমোগুণ প্রধান। ইহাই একে ত্রিমূর্ত্তি তিনে এক, একে তিন।

"ভক্ত-চিত্ত-সমাসীন-ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাত্মকঃ।
(সূত সংহিতা) ৩।৪৮

তিনি ভক্তের চিত্তে অধিষ্ঠিত, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক। পুনর্ব্বার—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।

গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদভেদমুপেয়ুষে—

সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অদ্বিতীয়, পরে গুণত্রয়ের উপাধি ভেদে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্নরূপ হও, বস্তুতঃ তিনে এক; একে তিন। তোমাকে নমস্কার। পুনর্ব্বার—

"আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্, রক্ষন্, হরন্, বিশ্বং দধে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥"
ভাগবত ৪।৭।৪৮

আমি গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নিষ্পন্ন করি, সেই সেই ক্রিয়ার অনুযায়ী আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর উপাধি হইয়াছে মাত্র। এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না, কিন্তু সাধকের জ্ঞানের দ্বারা দর্শন লাভ হয়। উর্ণনাভ যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে,সেইরূপ এই ব্রহ্মা,বিষ্ণু, মহেশ্বর (তিনে এক) প্রাকৃতিক জগত জালে নিজেকে আবৃত করিয়াছেন, ভেদ জ্ঞানের হেতু কর্ম্ম সমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখনই জীবগণের বিষ্ণু ও ব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে. যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলয় প্রাপ্ত হয়, যাহা সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে; সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান। অবিকাররূপ একমাত্র অগ্নি, বিকারভেদে বহুপ্রকারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী একরূপ হইয়াও অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, যাহা পরব্রহ্মেরই স্বরূপ, তাহাই বিষ্ণু ও মহেশ্বর। এই বিষ্ণু বা মহেশ্বর ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ, মহাভূতির আশ্রয়। এজগতে যাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্তই এই কারণ ব্রহ্মা বিষ্ণুতে লীন। বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। বিষ্ণুই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের স্রষ্টা এবং সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন।

বেদ ই এই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসূতি। বেদ

অপৌরুষের বাক্য। পৌরুষের বাক্যে অর্থের বন্ধন আছে, যেহেতু পুরুষ স্বয়ং বদ্ধ, যে বদ্ধ তাহার বাক্যও বদ্ধ, সুতরাং ব্যাকরণ অভিধান তাহার শক্তি গ্রাহক, কিন্তু অপৌরুষের বাক্য ব্রহ্মবাক্য। ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত, সুতরাং বেদের অর্থও নিত্য মুক্ত। বেদকে ব্যাকরণ বা অভিধান বন্ধন করিতে অপারগ। বেদ—"সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্টং গুরুমুপসদাদ"; বেদার্থ, সাধনসাধ্য, শিক্ষা ও দীক্ষা দ্বারা অনুভূত হয়। স্বয়ং তপোমার্জ্জিত হইয়া তপঃসিদ্ধবুদ্ধি গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে বেদার্থ অবগতি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

কাত্যায়নী ব্রতচ্ছলে গৃহনির্গতা রাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণ সহ মহারাসে ব্যাপৃতা, তখন আয়ান রাধিকার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ, কৃষ্ণা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রমদাকুলের উত্তমোত্তমা রাধিকাকে একাগ্রহৃদয়ে জগদম্বার চরণ যুগে ফল পুষ্পাদি নানা উপহারে পরমানন্দে পরমেশ্বরীর পূজায় নিরতা দেখিয়া আয়ান তদ্গত চিত্ত ও ভক্তিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, পিতা মাতৃরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। পিতার এই মাতৃরূপই সকলরূপের শ্রেষ্ঠ, আর পিতার তত্ত্বপ্রচারার্থ মাতৃরূপেরই প্রকাশ, কারণ ঐ তত্ত্ব মা ব্যতীত আর কেহ জানেন না; তাই পিতার তত্ত্ব এবং মায়ের স্নেহ পিতার স্নেহের অপেক্ষাও অধিক মধুর। মাতৃরূপ দেখিয়া আয়ান মুগ্ধ জগৎমুগ্ধ, আজ জগৎ দেখিতেছেন, সে—যিনি বৃন্দাবনের বনক্ষেত্রে তিনিই আবার শুম্ভনিশুম্ভের রণক্ষেত্রে, আর যিনি শুম্ভের রণক্ষেত্রে, তিনিই আবার কুরুক্ষেত্রে জনকই জননী, আর জননীই জনক। দুয়ে এক একেই দুই। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই; "একমেবা দ্বিতীয়ম্"। মায়ের এরূপ মাধুর্য্যে জগত উদ্ভাসিত। চতুর্ভুজে,—দক্ষিণে—নিম্নে বর,—ও ঊর্দ্ধে—অভয় বামে—নিম্নে—ছিন্নমস্তক—ঊর্দ্ধে অসি—এবং নরমুণ্ডমালায় বক্ষঃস্থল সুশোভিত; উত্তমাঙ্গের মধ্যস্থলে ধৃত সমুজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্র, অতিভয়ঙ্কর—দীর্ঘায়ত নয়নত্রয়—বিলসিত বদনমণ্ডল,—কুণ্ডলশোভিত গণ্ডদ্বয়। আবার আর একদিন লীলাবতারের আবরণ উন্মোচন করিয়া জনক, জননী হইয়া দিগম্বরীরূপে, মহাকাল—মহাকালী হইয়া শিবামূর্ত্তিতে অর্জ্জুনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সেই বিশ্বগ্রাসকারিণী মহাপ্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি, আবার—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ

গগনপথে একসময়ে উদিত সহস্রসূর্য্যের প্রভাও মায়ের রূপের প্রভার তুল্য হয় না। মা আমার স্মেরাননা সুখপ্রসন্নবদনা শান্তিরূপিণী নিত্যকালী—এবং পিতৃরূপে নিত্য কৃষ্ণ।

শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দাঁইহাট
কান্দির ব্রাহ্মণসভার সহকারী সভাপতি।

'কাদম্বরীর'—মহাশ্বেতা। (১)

সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরীর তুলনা নাই। ইহার মধুস্রাবিণী ভাষা স্বচ্ছ নদীস্রোতের মত পাঠককে ভাসাইয়া লইয়া যায়; ইহার সুকুমার ললিত পদবিন্যাস শ্রোতৃবৃন্দকে প্রতিপদে চমৎকৃত ও মোহিত করিয়া দেয়, ইহার নবনব ভাবভঙ্গী পূর্ণ বিকসিত শতদলের ন্যায় সহৃদয়ের মানসসরে ফুটিয়া উঠে। তরঙ্গিণীশয্যাপ্রসুপ্ত অপ্সরাসঙ্গীতের মত ইহার ঝঙ্কার, মনোরমা নবপ্রণয়িনীর নূপুর শিঞ্জিতের সদৃশ ইহার ধ্বনি, অমরাবতীস্থ নন্দনকাননের অম্লানবাসন্তীসুষমার তুল্য ইহার কল্পনা। কাদম্বরী সাহিত্যাকাশের ধ্রুবতারা। সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটী কোটী মানব ইহার পানে স্থির লক্ষ্যে চাহিয়া আছে; তবু ইহার নূতনত্ব কমে না, দর্শনলালসা মেটেনা। এই এক কাদম্বরী হইতে একইভাবে একইরূপ প্রভাতরলজ্যোতি ঐশীকরুণার মত নামিয়া আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্যটিকে চির আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, প্রকৃতির মধুময়ী বৃষ্টির মত স্বচ্ছ কিরণধারা ঝরিয়া ঝরিয়া নিরস হৃদয় ক্ষেত্রটিকে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া দিতেছে; স্বয়ংবেদ্য ব্রহ্মরসাস্বাদবৎ অমৃতবর্ষিণী রসধারা সহৃদয়ের চক্ষুকর্ণ মনপ্রাণ ভরিয়া অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, তার কি তুলনা আছে? সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী যেন আজি প্রেমময়ী হইয়া কাদম্বরীরূপে বিরাজমানা। (২) মৌলিক অপূর্ব্ব ঘটনা ইহার পাঞ্চভৌতিক শরীর, চরিত্রের বিশ্লেষণ ইহার বেশভূষা, উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি ও ব্যাজোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কার ইহার সুবর্ণভূষণ।

কাদম্বরী নায়িকা।

কাদম্বরীগ্রন্থের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির নামকরণ প্রকৃতই সার্থক। প্রধানা নায়িকা কাদম্বরীর নামানুসারে কবি কাব্যের নাম 'কাদম্বরী' রাখিয়াছেন। কাদম্বরী গন্ধর্ব্বকুমারী এবং প্রধানা নায়িকা; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ইঁহার জনক, অপ্সরা 'মদিরা' ইঁহার জননী। কাদম্বরীর আভিধানিক অর্থ "সুরা"। সুরারমত ইঁহার সমুজ্জ্বল বর্ণ, সুরার মত ইঁহার ঢলঢল লাবণ্য, সুরার মতই ইঁহার যৌবনশোভা উন্মাদক ও মোহকরী—এই জন্য—কিম্বা, "কাদম্ব কলহংসইব রৌতি" কলহংসের গুঞ্জনধ্বনির মত ইঁহার স্বর মিষ্ট—এইজন্য কবি নায়িকার নাম কাদম্বরী রাখিয়াছেন। কাদম্বরীর প্রণয়পাত্রের নাম "চন্দ্রাপীড়"—ইনি এই গ্রন্থের প্রধান নায়ক। চন্দ্র যাঁহার শিরোভূষণ তিনি 'চন্দ্রাপীড়', অথবা চন্দ্রদেবই অভিশপ্ত হইয়া রাজপুত্ররূপে জন্মিয়াছেন বলিয়া চন্দ্রাপীড়। কাদম্বরী রজোগুণোদ্ভবা—তাই ইঁহার বর্ণ নবোদিত বালতপনবৎ লোহিতোজ্জ্বল, তাই ইঁহার লাবণ্য মুক্তাফলবৎ স্বচ্ছ, তাই ইঁহার সৌন্দর্য্য দীপাবলিতেজে উজ্জ্বল নাট্যশালার মত যুবজনপ্রিয়। তাই ইনি পরিপূর্ণ চন্দ্রকলার মত অগাধগাম্ভীর্য্য সমুদ্রবৎ অক্ষুব্ধ চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত উদ্বেলিত করিতে পারিয়াছিলেন।

---

(১) "কাদম্বরী" বাণভট্ট বিরচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য।

(২) কথা সরিৎসাগর হইতে কথঞ্চিত ঋণী মাত্র—লেখক।

"ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়াঃ।
যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি॥"

নৈষধচরিত।

কবি যথার্থই কাদম্বরীকে যোগ্যা বুঝিয়াই রাজরাজেশ্বর চন্দ্রাপীড়ের অনুরাগিণী করিয়াছেন। মণি মাণিক্যভূষিতা সুচতুরা রাজলক্ষ্মী রাজারই ভোগ্যা হইয়া থাকেন। মানুষীতে এরূপ আলোকসামান্য রূপসৌন্দর্য্য সম্ভবে না বলিয়াই কবি গন্ধর্ব্বাপ্সর মিশ্রিতরক্ত একই কাদম্বরীতে বহাইয়াছেন। হাবভাব বিলাস চাতুর্য্য দেখিলে ইঁহাকে মানবী বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল ভাবনিচয় ভারতীয় সংযমপূত ললনায় ঠিক সামঞ্জস্য পাইবেনা বুঝিয়াই কবি ইঁহাকে মানবী করেন নাই। রূপেগুণে, ভাবভঙ্গীতে কলাচাতুর্য্যে, বিলাসবিভবে কাদম্বরী অপূর্ব্ব নায়িকা।

"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"—

—অভিজ্ঞান শকুন্তল।

মহাশ্বেতা দ্বিতীয়া নায়িকা, কাদম্বরীর প্রাণ প্রিয়তমা সখী। ইনিও গন্ধর্ব্বনন্দিনী।

মহাশ্বেতা

শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত তুষার শুভ্র বসনা, বীণাপাণি সরস্বতীর মত সঙ্গীত কলানিপুণা বিদুষা—এই কারণে ইঁহার নাম "মহাশ্বেতা"। ইনি সত্ত্বগুণজা—তাই ইঁহার বর্ণ এত শুভ্র ও স্বচ্ছ; প্রকৃতিও স্নিগ্ধকোমল। রজোগুণ আড়ম্বর পূর্ণ সম্পৎ, রজরাগজ অনুরাগ, রজোদ্ভূত অসার সুখ ইঁহার কঠোর সংকল্পে কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিতে পারে নাই সত্ত্বগুণজা বলিয়াই মহাশ্বেতা পবিত্র প্রণয়বতী, সঙ্গীতবাদ্যনিরতা, শিবার্চ্চনাবহিতচিত্তা ও তপস্তেজঃ সমুজ্জ্বলা। মহাশ্বেতা প্রেমে সাবিত্রীর মত, বৈরাগ্যে গার্গীর মত, জ্ঞানে অরুন্ধতীর মত, গৃহকর্ম্মে দ্রৌপদীর মত, ধৈর্য্যে বসুন্ধরার মত, তেজস্বিতায় সতীর মত ছিলেন। ইঁহার কি তুলনা আছে? পুরাণের পরে এরূপ রমণী চিত্র আর কোন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় নাই। প্রবৃত্তি—নিবৃত্তির, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের, করুণা ও তেজস্বিতার এরূপ মিলনীস্থান এমত হৃদয়গ্রাহিণী করিয়া উপস্থাপিত করিতে কোন কবিই পারগ হয়েন নাই। শুভ্রশীতল বর্ণ, কোমল স্বভাবা মহাশ্বেতা মহর্ষি শ্বেতকেতুতনয় পুণ্ডরীকের অনুরাগিণী, ইহা যথার্থই বড় শোভন হইয়াছিল। স্বভাবসারল্য বিলাসবিভবহীন তপোবনেই অবস্থিতি করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের উত্তরে—কিংপুরুষবর্ষে—হেমকূট নামক বর্ষপর্ব্বতে, গন্ধর্ব্বাধিপতি চিত্ররথের অধীন থাকিয়া —গন্ধর্ব্বরাজ হংস রাজত্ব করিতেন।

মহাশ্বেতা পরভাগ।

কাদম্বরীর পিতা চিত্ররথ ইঁহার অভিন্নহৃদয় প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ হংস মহাশ্বেতার জনক, হিমকরশুভ্রা, অপ্সরকুলজা 'গৌরী' মহাশ্বেতার জননী। পিতার তেজস্বিতাদিগুণ ও মাতার সৌন্দর্য্য মহাশ্বেতাতে একাধারে বর্ত্তমান ছিল। শৈশব হইতেই মহাশ্বেতা কখন দেবী মূর্ত্তির মত রাজ দম্পতির দুগ্ধধবল দৃষ্টির দ্বারা স্নাত হইয়া, কখন বীণার মত গন্ধর্ব্বগণের অঙ্কে অঙ্কে আরূঢ় থাকিয়া, নানাবিধ রাজভোগে বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন। ক্রমে যখন যৌবনের বাল সূর্য্যাকরে মহাশ্বেতার শৈশবকাল কুয়াসার মত অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল, তখন নবযৌবন আসিয়া আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ মহাশ্বেতার চরণে বিলাসমন্থর গতি দেখা দিল, চক্ষুতে কটাক্ষ চঞ্চল দৃষ্টি খেলিল, কপোলে আরক্ত আভা ফুটিয়া

। নবপল্লব আসিয়া কুসুমকে ঘিরিয়া ফেলিল।

একদিন মধুমাসে মহাশ্বেতা তাঁহার মাতার সহিত অচ্ছোদ সরোবরে স্নানার্থ গমন করিলেন। স্নানান্তে মহাশ্বেতা অচ্ছোদ সরসীর তীরে সখীগণ সহ সচল বিদ্যুল্লতার মত খেলাইয়া বেড়াইতে ছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে দর্পণবৎ স্বচ্ছ হাস্যরাশির দ্বারা শুভ্র মুখখানিকে দ্বিগুণতর শুভ্র করিতেছিলেন—সেই শুভমুহূর্ত্তে তপস্যার্থ আগত সাক্ষাৎ মদনদেবের মত কপিঞ্জলসহায় পুণ্ডরীক তাঁহার নয়নগোচর হইলেন। মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের সেই অলৌকিকরূপ, অতুলনীয় তপঃপ্রভাব দেখিয়া কুসুমগন্ধে মধুকরীর মত আকৃষ্টা হইয়া পড়িলেন। পুণ্ডরীকও সমানবয়স্ক, অভিন্নহৃদয় বন্ধু কপিঞ্জলের সহিত অচ্ছোদসরোবরে স্নানার্থ আসিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক স্বর্গে জনক শ্বেতকেতুর আশ্রমে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, মর্ত্তে আসিয়াছেন শুনিয়া নন্দনলক্ষ্মী অনুরূপপাত্র বুঝিয়া স্বহস্তে ইঁহার কর্ণে পারিজাতমঞ্জরী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক রূপে, গুণে, প্রভাবে, লাবণ্যে আদর্শ নায়ক। ইহার চরণে যে মহাশ্বেতা আপনার প্রাণমন পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ দান করিয়া কৃতার্থ হইবে, ইহার আশ্চর্য্য কি?

পুণ্ডরীক দর্শন।

এদিকে মহাশ্বেতার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বলিত পূর্ণবিকসিত যৌবন, পরিমলপূর্ণ অম্লানকুসুমবৎ অনিন্দ্যরূপ, লজ্জারাগরঞ্জিত অদৃষ্টপূর্ব্ব মুক্তাফলচ্ছায়া তরল লাবণ্য—পুণ্ডরীকের চিত্তে কামের অনলশিখা জ্বালিয়া দিল। ব্রাহ্মণকুমারের অনুরাগভরা দৃষ্টি মহাশ্বেতার মুখোপরি নিপাত করিয়া তাঁর অমানুষীরূপ সুধাপানে ব্যাপৃত রহিল। উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ রহিলেন। দৈহিক মিলন অপেক্ষা শতগুণ যে মানসমিলন, তাহাই সংসাধিত হইল। মদনদেবকে সাক্ষী করিয়া অন্তরে অন্তরে পরস্পর পরস্পরের নিকট আত্মবিক্রয়রূপ পরিণয় বন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

মহাশ্বেতা আপনার পবিত্রপ্রাণ পুণ্ডরীককে অর্পণ করিয়া, তাহার বিনিময়ে প্রিয়তমস্পর্শপবিত্রীকৃত পারিজাতমঞ্জরী গ্রহণ করিয়া রূপদর্শন বিহ্বল পুণ্ডরীকের করতলভ্রষ্ট জপার্থ অক্ষমালা কুড়াইয়া লইয়া যখন ফিরিবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় বন্ধু কপিঞ্জল কর্ত্তৃক যথোচিত ভর্ৎসিত হইয়া পুণ্ডরীক অক্ষমালার প্রার্থনায় মহাশ্বেতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অন্ধপ্রেমিক অক্ষমালাবোধে মহাশ্বেতার গলদেশস্থ একাবলীহার কণ্ঠে দিয়া ফিরিলেন। প্রেমের অধিদেবতা কর্ত্তৃক এইরূপে মাল্য বিনিময় কার্য্য সমাধা হইল। বসন্তকালে অচ্ছোদ সরসীর রমণীয় তীরতলে বিবাহযোগ্য যুবকযুবতীর উপর প্রেমদেবতার শরক্ষেপ কখন ব্যর্থ হয় না। ধৈর্য্য, সংযম, লজ্জা, ভীতি সকলই বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যায়; ব্রহ্মচর্য্য, পাণ্ডিত্য, উপদেশ কোন ফলই দর্শাইতে পারে না। কপিঞ্জলকে লুকাইয়া পুণ্ডরীক আপনার সম্ভ্রম প্রভৃতি গণনা না করিয়া মহাশ্বেতার নিকট তাহার প্রাণতুল্য সখী তরলিকার হাত দিয়া একখানি প্রেম পত্রিকা প্রেরণ করিলেন।

পুণ্ডরীকের কার্য্য।

মহাশ্বেতা অনিচ্ছায় অঙ্কুশাঘাতভীত করিণীর মত মাতার অনুগামিনী হইলেন। পুণ্ডরীকাধ্যুষিত সেই পুণ্যতীর্থ ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছা বশতঃ চরণযুগল সঞ্জীরণকে না না

মহাশ্বেতার ভাব।

করিয়া বারণ করিতে ছিল। চরণ আর চলে না, পথ আর ফুরায় না। নিজের হৃদয়টিকে প্রিয়তমকে যৌতুক-স্বরূপ দিয়া তাঁহার হৃদয়টিকে সঙ্গে লইয়া মহাশ্বেতা অনেক কষ্টে আপনার গৃহে পৌঁছিলেন। যে গৃহ কলহাস্যে—হংসমালাগুঞ্জনে—সখীজন আলাপে—একদিন মুখরিত ছিল, সে গৃহ আজ নিরানন্দ নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইল। আলোকমালা সমুজ্জ্বল হাস্যময়ী নাট্যশালা মুহূর্ত্তে অন্ধকারময়ী হইয়া উঠিল। সময় আর কাটে না, চক্ষু পুণ্ডরীক ব্যতীত আর কিছু দেখিতে চাহে না. মনও পুণ্ডরীক বিষয়িণী চিন্তা করিতে ভাল বাসে। অনিশ্চিত পুণ্ডরীকাশায় প্রেমবিহ্বলা রমণী একবিন্দু বারিকাঙ্ক্ষিনী চাতকীর মত উর্দ্ধে লক্ষ্যে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তরলিকা আসিয়া যখন পুণ্ডরীকের প্রেমপত্র হাতে দিল—তখন মহাশ্বেতা তরলিকাকে আলিঙ্গনবদ্ধা—করিয়া কতবার সেই পত্র পড়িলেন, কতবার পুনঃ পুনঃ পুণ্ডরীকের কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক কি বলিলেন, তাঁহাকে কেমন দেখিলে, তিনি কতক্ষণ তোমার নিকট ছিলেন, কতপথ অনুগমন করিয়াছিলেন—বারংবার এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। মহাশ্বেতার আপাততঃ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়াই উঠে। শুষ্কক্ষেত্রে সবেমাত্র বারি বিন্দু পাত হইয়াছে, ফল সমাপ্তি না হইলে তৃপ্তির শেষ কোথায়?

মহাশ্বেতার বাসনা—পক্ষিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পুণ্ডরীকের হৃদয় পিঞ্জরে প্রবেশ করে, যজ্ঞীয় হোমশিখার মত আকাশপথ চাহিয়া পুণ্ডরীকাধ্যুষিত স্বর্গধামে গমন করে। মহাশ্বেতা মনের সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া কোনমতে পুণ্ডরীক হইতে আপনার চিত্তটাকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইলেন না। তখন প্রণয়পরবশা যুবতী আপনার হৃদয় সিংহাসনে পুণ্ডরীককে পতিরূপে বসাইয়া তাঁহাকেই পূজা করিতে লাগিলেন, স্বেদজলসিক্ত কম্পিত দেহযষ্টি কোনমতে বিধৃত করিয়া অলস ভাবে শয্যা গ্রহণ করিলেন।

এমন সময়ে মদনেরসখা বসন্তের মত কপিঞ্জল আসিয়া তথায় মহাশ্বেতার সম্মুখে উপস্থিত। মহাশ্বেতা তাঁহাকে মহাসমাদরে বসাইয়া স্বয়ং নিরাসনে সম্মুখে উপবিষ্টা।

কপিঞ্জলের দৌত্য। কপিঞ্জল মহাশ্বেতার সম্মতি লইয়া বলিতে লাগিলেন।

মহাশ্বেতা, রাজকন্যা সুচতুরা বিলাসিনী সুন্দরী রমণী কোথা? আর স্বভাবসরল বনবাসনিরত জটাবল্কলধারী মুনিপুত্রই বা কোথা? একদিকে মনিমাণিক্য-ভূষিতা রাজলক্ষ্মী, অন্যদিকে ধনসম্পত্তিরহিত দরিদ্র! তোমাহইতে বন্ধুর মন ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, অনেক উপদেশ অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছি, কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার মন কোন মতেই শান্ত করিতে পারিলাম না। বন্ধু আমার ধীর জ্ঞানী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ঋষিকুমার হইয়া তুচ্ছ রমণীপ্রেমে আজি উন্মত্ত প্রায়। সকলই দুর্ভাগ্য! কি করি? কাজেই লতাকুঞ্জগৃহে নবপল্লবশয্যায় শয়ন করাইয়া তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতে লাগিলাম। ক্রমশই তোমার জন্য বন্ধু আমার এমন অবস্থায় উপনীত হইতে বসিয়াছেন যে, হয়ত তোমার আশায় নিরাশ হইলে তাঁহার প্রাণ

ত্যাগ হইবার সম্ভাবনা। আমি বন্ধুর জীবনাশঙ্কায় আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তোমার আশায় এখনও বন্ধু কোন মতে অতৃপ্ত জীবনকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মহাশ্বেতে! আমার বন্ধুর,—তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী ঋষিনন্দনের অমূল্য জীবন ভিক্ষা দাও। তোমার স্পর্শরূপমৃতসঞ্জীবিনী ভিন্ন তাহার জীবনরক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। জলদ্ব্রহ্মতেজা শ্বেতকেতু তনয়, বেদবেদান্তাভিজ্ঞ, তপশ্চর্য্যানিরত পুণ্ডরীক আজ মদন শরাহত হইয়া মৃতপ্রায়। আর আমি তোমার নিকট তার জীবনরক্ষার্থ প্রার্থী। একি কম লজ্জার কথা! এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই কর। এই পর্য্যন্ত বলা হইলে পর বন্ধুগত-প্রাণ কপিঞ্জল দরদরধারে রোদন করিতে লাগিলেন, মহাশ্বেতার একটী মুখের কথার উত্তর প্রত্যাশায় কপিঞ্জলের হৃদ্‌পিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। মহাশ্বেতার মাতা কন্যাকে দেখিতে আসিতেছেন, শুনিয়া কপিঞ্জল চলিয়া গেলেন।

মাতা কন্যার অসুখ দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন। মহাশ্বেতার মনে কপিঞ্জলের কথাগুলি শেলসম বিদ্ধ রহিল, তাঁহার জন্য আজ ঋষিকুমার মৃতপ্রায়—এ সংবাদ শুনিয়া প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তরলিকা, কি করি! লজ্জাভয় জলাঞ্জলি দিয়া, গুরুজনের মতের অপেক্ষা না করিয়া ইতর রমণীর মত প্রণয়িসকাশে যাইব? বংশ মর্য্যাদা, সামাজিকতা, সদাচারের মস্তকে পদাঘাত করিব? আর নহিলে যে আমারই জন্য অকলঙ্কচরিত্র পুণ্ডরীকের প্রাণত্যাগ হয়! মুনিকুমারের অমূল্য জীবনের বধ জন্য পাতকিনী হইবই বা কিরূপে? বল—তরলিকা, এক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য? নিজের কুল মর্য্যাদা লজ্জাভয়, এগুলি কি ঋষি হত্যার চেয়েও বড়?

পুণ্ডরীকের জীবন রক্ষাকরাই কর্ত্তব্য ইহাই তরলিকার মত শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া মহাশ্বেতা ভাবিলেন—"নিজের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি, আদর্শ পুণ্ডরীকের মত পতির সমাগমলাভ, যৌবন সহজপ্রণয়লালসার পূরণ মহাশ্বেতা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু এই তুচ্ছ হতভাগিনী রমণীর জন্য একটি অমূল্য আদর্শ প্রাণ নষ্ট হইতে বসিয়াছে—ইহাই বা অগ্রাহ্য করি কিরূপে?

নীলাঞ্চলাবৃতগাত্রা মহাশ্বেতা তখন অভিসারিকা, জনসঙ্কুল পথদিয়া চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত নিশীথে পুণ্ডরীক জীবনরক্ষার্থ যাত্রা করিলেন। প্রিয়তম ঋষি কুমারের জীবন সংশয়, নতুবা প্রতিপদেই মহাশ্বেতার গমন পক্ষে বিঘ্ন সঙ্কুল বলিয়া বোধ হইত। এ চিত্র কি অপূর্ব্ব! কি সার্থক এ রমণী সৃষ্টি! প্রেম প্রবণতার সহিত বিচার শক্তির এরূপ একত্রাবস্থান, প্রণয়বিহ্বলতার সহিত ধীরতার এরূপ একস্থানে মিলন প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। রমণীর কুসুম কোমল হৃদয়ও যে বজ্রবৎ কঠোর—ইহা মহাশ্বেতা চরিত্রে স্পষ্টই দেদীপ্যমান। ক্ষণেক পথ অতিক্রম হইলে পর দূর হইতে একটি অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি আকাশের গায় ভাসিয়া মহাশ্বেতার দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল, তীব্র তড়িৎ যেন অন্তরাত্মাকে নিস্পন্দ করিয়া দিল।

যখন মহাশ্বেতা কুঞ্জগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন—তখন দেখিলেন যে, পুণ্ডরীকের নিশ্চল তারক চক্ষু দুইটি আকাশস্থ চন্দ্র লক্ষ্যে স্থির, করযুগল নিস্পন্দ বক্ষের উপর

পুণ্ডরীক

সন্নিবেশিত। মহাশ্বেতাকে দেখিবামাত্র কপিঞ্জল "অব্রহ্মণ্য" বলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকরিয়া উঠিলেন। মহাশ্বেতা বুঝিলেন—তাঁহার কামনাময় ইন্দ্রধনু জন্মের মত মুছিয়া গিয়াছে; তাঁহার উচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হৃদয়ের মাঝখানে রহস্যময় ছায়াপথের মত কি একটি জিনিষ সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যৌবনেই মহাশ্বেতার আশাভরসা লোপ পাইল, অপ্রত্যাশিত শোকের আঘাতে প্রণয়কোমল হৃদয় একেবারে দ্বিধা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; ফুটিতে না ফুটিতে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ঝলসিত হইল। তখন মহাশ্বেতা চিত্রপুত্তলিকাবৎ স্থিরা, পাষাণপ্রতিমাবৎ নিষ্পন্দ হইয়া তরলিকার স্কন্ধে দেহভার রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া পুণ্ডরীকের আত্মাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার আকাশ পথে চলিয়া যাইলেন। তাহা দেখিয়া কপিঞ্জল ও বদ্ধপরিকর হইয়া "দুরাত্মন্ কোথা যাইতেছ" বলিতে বলিতে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের অনুসরণ করিলেন। কপিঞ্জল তখন শোকোন্মত্ত, তাঁহার আর স্মরণ রহিল না যে, মহাশ্বেতার কি হইবে? তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে দৈববাণী শোনা গেল "মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের দেহ রক্ষাকর! পুণ্ডরীক দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হইবে।"

মহাশ্বেতা কপিঞ্জলকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার ভাবিলেন যে, সহমরণে যাইয়া এ জন্মের দুঃখ শোকের সমাপ্তি করি, আবার ভাবিলেন—"না, তাহা হইতে পারে না। পুণ্ডরীকের দেহ রক্ষা আমাকে করিতে হইবে।" দৈববাণীর উপর বিশ্বাস রাখিয়া মহাশ্বেতা ব্রহ্মচর্য্যপালনেই সঙ্কল্প নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাখিয়া যৌবনের অপূর্ব্ব মাধুরী লুকাইলেন, আর্দ্রবল্কলে সুকুমার শরীর ঢাকিয়া রাখিলেন, সুচিক্কণ তরঙ্গিত কেশ পাশ কাটিয়া তৎস্থালে জটা রচনা করিলেন; মহামূল্য বেশভূষা, হীরক খচিত স্বর্ণালঙ্কার দূরে ফেলিয়া বৈধব্যের সাজে সাজিলেন। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলে মিলিয়া এই কঠোর সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু মহাশ্বেতা যোগিনী তপস্বিনীর বেশে অচ্ছোদ সরোবরতীরে শিবারাধনায় সময় কাটাইতেই চিত্ত স্থির করায় তাঁহাদের যত্ন নিষ্ফল হইল। সুকুমার শিরীষপেলব-অঙ্গ তপস্যার যোগ্য নহে তবুও মানসিক-বলে মহাশ্বেতা অসম্ভব সাধনে সংকল্প করিলেন।

কখন মহাশ্বেতা বনভূমি হইতে সুরভি পুষ্পনিচয় চয়ন করিয়া তাহাতে চন্দন মাখাইয়া দেবাদিদেবের চরণপদ্মে অর্পণ করিতেন কখন সান্ত্বনাস্থল বীণাটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহা হইতে চিত্তবিনোদক রাগরাগিণী বাহির করিয়া শোকসঙ্গীতে বনভূমি মাতাইয়া দিতেন। কখন বা স্বচ্ছ সলিল অচ্ছোদ-সরসীর লতাকুঞ্জে বসিয়া এক মনে পুণ্ডরীকের রূপ ধ্যান করিয়া সময় কাটাইতেন, যখন চক্ষু মুদিয়া তপস্বিনীবেশে আর্দ্রবল্কলধারিণী মহাশ্বেতা পূজায় বসিতেন, তখন বোধ হইত, যেন ভগবতী উমা পতির প্রসন্নতালাভের জন্য তপস্যার্থ আবির্ভূতা।

এই ভাবে কতদিন কতমাস কত বৎসর কাটিয়া গেল—মহাশ্বেতা সমানই অক্লান্তা! পুণ্ডরীক যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তখন আকাশে ষোলকলা শশী পূর্ণহাস্যে বিরাজ

মান ছিল, পূর্ণচন্দ্রের সে শোভা সে হাসি পুণ্ডরীককে আরও বিহ্বল করিয়া তুলিল পুণ্ডরীকের মনে হইল, পূর্ণহাস্তের অন্তরালে ব্যঙ্গের বিষজ্বালা, অমৃতপূরপ্রবাহ মধ্যে কর্ম্মনাশানদী স্রোত লুকায়িত রহিয়াছে—তাই অন্তিমশয়নে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ কুমার চন্দ্রদেবকে অভিশাপ দিলেন—দেখ চন্দ্র, তুমি যেমন আমার বিরহজ্বালা বাড়াইয়া দিয়া মৃত্যুপথারূঢ় আমার প্রতি অমৃতরশ্মির বিনিময়ে ঝলকে ঝলকে কালকূট বৃষ্টি করিলে, আর আমার আশাসমুজ্জ্বল অতৃপ্ত জীবনের অবসান করিয়া দিলে তোমাকেও তদ্রূপ আমার মত এই প্রকার কষ্ট পাইয়া অতৃপ্ত জীবন ত্যাগ করিতে হইবে।

পুণ্ডরীক কর্ত্তৃক অভিশপ্ত চন্দ্র ও প্রতি শাপ দিলেন—যেমন নিরপরাধ আমাকে অভিশাপ দিলে; এই পাপের ফলে তোমাকে পুনরায় এই ভাবে আরও শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারাইতে হইবে।

ঋষিকুমারের অভিশাপে আকাশের চন্দ্রকে ভূতলে আসিয়া তারাপীড়ের ঔরসে বিলাসবতীর গর্ভে চন্দ্রাপীড়রূপে ভারতবর্ষের উজ্জয়িনীনগরে জন্মগ্রহণ করিতে হইল। চন্দ্রাপীড় রাজকুমারোচিত বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া যখন রাজপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার অভিলাষ জন্মিল যে, মৃগয়া করিতে দূরদেশে যাইতে হইবে। মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা ও অনুচর বর্গকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রপীড় মৃগয়ায় গেলেন। কিন্নরমিথুন অন্বেষণে ক্রমশই গভীর অরণ্যে যখন প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি একাকী, ইন্দ্রায়ুধ নামক অশ্বই

চন্দ্রাপীড়।

একমাত্র সহায়। দূর হইতে সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া চন্দ্রাপীড় সঙ্গীত লক্ষ্যে অচ্ছোদ সরসীতীরে পৌঁছিলেন। ব্রতকর্ষিতাঙ্গী হৃদয়া শিবার্চ্চনতৎপরা মহাশ্বেতা সেই বনে বনদেবীরূপে বিরাজমানা। রাজপুত্রকে মহাশ্বেতা অতিথিরূপে পাইয়া যথাযোগ্য আতিথ্য সৎকার করিলেন। আপনার দুঃখ কষ্ট গণনা না করিয়া চন্দ্রাপীড়ের সহিত মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আপনার নির্জ্জন বনবাস,তপস্বিনী ভাবে অবস্থান ও শিবার্চ্চনতৎপরতার কারণ ব্যক্ত করিলেন। মহাশ্বেতা যখন তাঁর দুর্ভাগ্যময় অতীত বৃত্তান্ত, দুঃখময় জীবনের ইতিহাস মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন, বর্ণনার ফলে বহুবৎসর নিরুদ্ধ শোকদ্বার সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল; বাষ্পপূর্ণ নয়ন হইতে মুখমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ছিন্নহার মুক্তাফলের মত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এতদিন ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যের আবরণে যাহা অবরুদ্ধ ছিল, আজ তাহা অপসারিত হইয়া গেল।

মহাশ্বেতার বৈধব্যদশা দেখিয়া প্রাণসখী কাদম্বরী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। কাদম্বরীর পিতা মাতা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কাদম্বরীর দৃঢ় সঙ্কল্প টলিল না। তখন মহাশ্বেতাও কাদম্বরীকে অনুরোধ জানাইয়া তরলিকাকে প্রেরণ করেন। সেইদিন তরলিকা আসিয়া জানাইল যে, কাদম্বরী তাহার সখী মহাশ্বেতার বৈধব্যদশা থাকিতে নিজে পতি সমাগম সুখে লীলায়িতা হইবেন না। তখন মহাশ্বেতার মনে হইল যে, চন্দ্রাপীড়কে কাদম্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করাইতে পারিলে নিশ্চয়ই সখী রাজকুমারের রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া

পড়িবে; ইহাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে। তখন মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়কে কহিলেন—"রাজকুমার! চিত্ররকুট পর্ব্বত, গন্ধর্ব্বনগর, সখী কাদম্বরী ও রমণীয় স্বর্গলোক দর্শনের যদি কৌতুহল থাকে, যদি আমার অনুরোধ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া বোধ হয়, বিশেষ কার্য্যের যদি ক্ষতি না হয়, তবে আমার সহিত তথায় চলুন।" চন্দ্রাপীড়কে লইয়া মহাশ্বেতা সখীর নিকট গেলেন।

কয়েকদিন তথায় কাটিয়া গেলে পর রাজা তারাপীড়ের নিকট হইতে রাজকুমার পত্র পাইলেন যে, পত্রপাঠ মাত্র যেন উজ্জয়নীতে ফিরিয়া আসেন। তখন কাদম্বরী দর্শন লালসা কোনরূপে সংযত করিয়া পিতার আদেশ মত চন্দ্রাপীড় উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন প্রিয়বন্ধু বৈশাম্পায়নকে আদেশ দিয়া যান, তিনি শীঘ্রই অনুচরবৃন্দ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুন।

চন্দ্রাপীড়ের উজ্জয়িনী যাত্রার পরই বৈশম্পায়ন একদিন অচ্ছোদসরসী সলিলে অবগাহন করিয়া অত্রস্থ মহাদেব আরাধনা করিতে গেলেন? অচ্ছোদসরসীর রমণীয় তীরতল, উন্মাদক-লতাকুঞ্জবন দেখিয়া বৈশাম্পায়নের অন্তরে কি যেন অস্পষ্ট স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কি এক মোহকর অজ্ঞাত কারণে আকৃষ্ট হইয়া বৈশাম্পায়ন সে স্থান ছাড়িয়া কোনমতে যাইতে চাহিলেন না। অনুচরবৃন্দকে বিদায় দিয়া সেই নির্জ্জন অরণ্যে একাকী উন্মাদের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কাদম্বরীর নিকটে বিদায় লইয়া মহাশ্বেতাও নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। মহাশ্বেতাকে দেখিয়াই বৈশম্পায়নের জন্মান্তরানুবদ্ধ নিবিড়বাসনা, পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত

বৈশম্পায়ন।

অতৃপ্ত প্রেম লালসা ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলেই পূর্ব্বজন্ম সংস্কার উন্মুখ হইয়া উঠে। অনন্যদৃষ্টি বৈশম্পায়ন ভীত লজ্জিত বিষণ্ণ ও মত্ত হইয়া মহাশ্বেতার প্রণয়ভিক্ষা চাহিলেন। কাতরকণ্ঠে প্রার্থিত প্রণয় ভিক্ষার কোন সান্ত্বনা মূলক উত্তরের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য পাইয়া বৈশম্পায়ন ম্লানমুখে ফিরিয়া গেলেন। বৈশম্পায়ন কোন মতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না।

একদিন গভীর রজনীতে চন্দ্রালোকোদ্দীপ্ত মুক্ত আকাশ তলে, মসৃণিত শিলাতলে মহাশ্বেতা বিশ্রম্ভশায়িতা। এমন সময়ে চোরের মত কামুক বৈশম্পায়ন নিঃশব্দপদসঞ্চারে তথায় আসিয়া উপস্থিত। সেই উন্মাদ, নতজানু, তৃষ্ণাতরলচক্ষু, পতিব্রতা মহাশ্বেতার নিকট আপনার পাপ বাসনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাপীড়ের আবাল্য সঙ্গী প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মহাশ্বেতা কিছুই জানেন না। কামুক পাছে দেবনিবেদিত অঙ্গস্পর্শ করে এই ভয়ে পুণ্ডরীকচিন্তনরতা তপঃকৃশাঙ্গী মহাশ্বেতার সতীত্ব মহিমোদ্দীপ্ত রোষানল জ্বলিয়া উঠিল, বাতাহতকদলীবৎ সেই সুকুমার যৌবনোৎফুল্ল অঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; মহাশ্বেতা ক্রোধরুক্ষ স্বরে কামুককে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন—"পাপিষ্ঠ, এই পাপ বাসনা ব্যক্ত করিবার সময়ে আকাশের বজ্র কেন তোমার মাথায় পড়িল না? জিহ্বা কেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইল না? ভগবতী বসুন্ধরা, এই ঘৃণ্য পাপ দেহ রসাতলে না পাঠাইয়া অদ্যাপি বহন করিতেছেন কেন? পক্ষিজাতির মত কামচারী এই পাপাত্মার পক্ষিযোনিপ্রাপ্তিই যোগ্য

অভিশাপ।

পরিণাম। ভগবন্, আমি যদি ভুলেও পুণ্ডরীক ব্যতীত অপর পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য যেন অন্যথা না হয়।"

শুকজীবন।

তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল তরুর মত কাম-পীড়িত বৈশম্পায়নের দেহ অচেতনবৎ ক্ষিতিতলে নিপতিত হইল। সতীর বাক্য অন্যথা হয় না। বৈশম্পায়নের শুকরূপে জন্মলাভ ঘটিল। সদ্যোজাতশুক ব্যাধকর্ত্তৃক পাতিত হইয়াও স্বকৃত দুষ্কৃতিভোগের জন্যই জীবিত রহিল। জৈবলিঋষি যখন শুকের জীবনেতিহাস ছাত্রগণের নিকট কহিলেন, শুকের পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি স্পষ্টই উদ্রিক্ত হইল। তখন সেই শুক দুর্ব্বলপক্ষে ভর দিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমাভিমুখে উড্ডীয়মান হইল। পুত্র-বাৎসল্যে কাতরপ্রাণ শ্বেতকেতু পুণ্ডরীকজননী লক্ষ্মীদেবীকে, কামমুগ্ধচিত্ত শুকপাক্ষরূপী সন্তানকে অবিলম্বে পিঞ্জরে রুদ্ধ করার জন্য আদেশ করিলেন। কৃতকর্ম্মের যতদিন ভোগ অবশিষ্ট আছে; ততদিন যন্ত্রনা সহ্য করিতেই হইবে।

মহাশ্বেতা কি করিয়া জানিবেন যে, দেহান্তরের প্রগাঢ় ভালবাসা বিস্মৃত হইতে না পারিয়া পুণ্ডরীক—প্রেমপ্রার্থীরূপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন। মহাশ্বেতা অনন্যমনে মদনপ্রণয়িনী রতির মত পতির জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষায় শিব আরাধনা করিতে থাকিলেন। দৈববাণী কখন ব্যর্থ হয় না, জন্মান্তর কৃত কর্ম্মফল কখন ভোগ ব্যতীত বিরত হয় না। ঈশ্বরারাধনারূপ কঠোর সাধনা কখন বৈফল্যকে বরণ করে না।

অনেকদিন হইয়া গেল, বৈশম্পায়ন ফিরিতেছে না দেখিয়া তাঁহার পিতা শুকনাস বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন পিতামাতার আজ্ঞায় শুকনাসের অনুরোধে চন্দ্রাপীড়কে বৈশম্পায়নের অন্বেষণে পুনরায় মহাশ্বেতার আশ্রমে যাইতে হইল। আশ্রমে আসিয়া চন্দ্রাপীড় যখন বন্ধুর দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন, তখনই তাঁহারও বক্ষ স্ফুটিত হইয়া গেল। অকালে, যৌবনে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরী-দর্শন-লালসা ক্ষুণ্ণ প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রিয়তমের আগমন সংবাদ শুনিয়া কাদম্বরী বড় সাধে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, নেত্রের অমৃতশলাকা, স্বজীবনের অবলম্বন, প্রাণের রসায়ন, যৌবনের দেবতা চন্দ্রাপীড় আর জীবিত নাই। কাদম্বরী সমস্ত আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সহমরণ যাত্রার আয়োজন করিবেন বুঝিয়া চন্দ্রাপীড়-দেহ হইতে নিক্রান্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তখন সান্ত্বনা দিলেন যে, চন্দ্রাপীড় জীবিত হইবেন। ঐ দেহ কাদম্বরীস্পর্শে অবিকৃত থাকিবে। এই সংবাদ ক্রমে উজ্জয়িনীতে পৌঁছিল। রাজা রাণী প্রভৃতি সকলে তথায় আসিলেন। কাদম্বরী রাজকন্যা হইয়াও সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিরাগিণী তপস্বিনী সাজিলেন। দুইটা সখী শিথিল বৃন্ত কুসুমের মত কোনমতে জীবন বৃক্ষে বিযুক্ত রহিল।

চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু।

যখন বৈশম্পায়নের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াই পুণ্ডরীক-দত্ত শাপের অলঙ্ঘ্যতার জন্যই চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় স্ফুটিত হইল, তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাপীড় সহচরী রাজকন্যা পত্রলেখা ইন্দ্রায়ুধনামক অশ্বকে লইয়া অচ্ছোদসরোবরে নিমজ্জিত হইয়া গেল। ক্ষণপরে অচ্ছোদসলিল হইতে যেন স্নাত হইয়াই কপিঞ্জল মহাশ্বেতার সমীপে উপস্থিত হইয়া

কহিলেন, "মহাশ্বেতা! আমাকে স্মরণ পড়িতেছে কি?"

মহাশ্বেতা আপনার সৌভাগ্যতপনোদয়ের অরুণস্বরূপ কপিঞ্জলকে মহাসমাদরে অভিবাদন করিলেন। বন্ধুর জন্য মহাশ্বেতা একবৎসর অপেক্ষা করিতেছেন, সর্ব্বসুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া যোগিনী তপস্বিনী সাজিয়া পতির জীবন লাভের জন্য আরাধনায় মন দিয়াছেন জানিয়া কপিঞ্জলের অন্তর সহানুভূতি ও গভীর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, মহাশ্বেতা সত্যই দেবী। এরূপ পত্নীলাভ বন্ধুর বাস্তবিকই মহাপুণ্যের ফল।

কপিঞ্জল তখন মহাশ্বেতাকে কহিলেন, মহাশ্বেতা, আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া জানিলাম, তিনি স্বয়ং চন্দ্রদেব। তিনি বিনয়নম্রস্বরে আমাকে কহিলেন—"কপিঞ্জল, পুণ্ডরীক মৃত্যুর সময়ে আমাকে বিনাদোষে অভিশাপ দিয়াছেন, তৎফলে আমাকে ভারতবর্ষে উজ্জয়িনাধিপতি তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়রূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দিয়াছি যে তোমাকেও ইহাপেক্ষা শোচনীয়ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমি চন্দ্রাপীড় হইয়া জন্মিতেছি, পুণ্ডরীক ও উজ্জয়িনী অধিপতির মন্ত্রী শুকনাশেরপুত্র বৈশম্পায়নরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। তুমি এক্ষণে মহর্ষি শ্বেতকেতুর আশ্রমে গমন কর। কি জানি, যদি পুনরায় আর কোন দুর্দৈব উপস্থিত হয়।"

কপিঞ্জলের কাহিনী।

চন্দ্রদেবের পরামর্শমতে আমি মহর্ষি শ্বেতকেতুর আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার মন তখন কিরূপ ব্যগ্র কিরূপ শোকাকুল, কি প্রকার উন্মত্তপ্রায় তাহা বুঝিতে পারিতেছই। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যাইতেছিলাম. দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন বৈমানিক দেবতাকে লঙ্ঘন করিয়া ফেলি। তিনি আমাকে শাপ দিলেন, "যেমন তুমি তুরঙ্গমের মত লম্ফ দিয়া আমাকে লঙ্ঘন করিলে, তেমি তোমাকে তুরঙ্গম জন্মলাভ করিতে হইবে।" আমার অজ্ঞানতাবশতঃ এই দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে যখন আমূল-ঘটনা বিবৃত করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী হইলাম, তখন তিনি কহিলেন, "তোমার প্রভুর যখন মৃত্যু হইবে তখনই অশ্বযোনি হইতে তুমি মুক্তি পাইবে"। আমি তখন এইটুকু অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলাম যে, "বন্ধু আমার যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিবেন—সেই স্থানেই যেমন আমার জন্ম হয়।" তিনি স্বীকার করিলেন। মহাশ্বেতা, আমিই এতকাল ইন্দ্রায়ুধ নাম ধরিয়া চন্দ্রাপীড়ের বাহনরূপে ছিলাম। নির্জ্জনবনে তোমার শোকসঙ্গীত শুনিয়া মন্ত্রাকৃষ্ট সর্পের মত উৎকর্ণ হইয়াছিলাম। তাহার ফলেই চন্দ্রাপীড় প্রথম তোমার আশ্রমে আসেন। পুণ্ডরীকই বৈশম্পায়ন-জন্মে তোমার নিকট আসিয়াছিলেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রণয় স্মৃতি-বশেই তোমার সমীপে প্রেম-ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি না জানিয়া তাঁহাকে কঠোর অভিশাপ দিয়াছ, তাহার ফলেই তিনি শুকপক্ষী হইয়া জন্মিয়াছেন। তোমার কোনও দোষ নাই সকলই বন্ধুর কৃতকর্ম্মফল। মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট যাই, দেখি—তিনি যদি শাপ বিমোচনের কোন ব্যবস্থা করেন। পুণ্ডরীকজননী লক্ষ্মীদেবীকেও সংবাদ দিয়া আসি। শীঘ্রই শাপ মোচন হইবে বলিয়া বোধ হয়। কবে শাপ বিমোচন হইবে,

কিরূপে পুণ্ডরীক দেহপ্রাপ্তি ঘটিবে, কি প্রকারেই বা তোমাকে লাভ করিয়া বন্ধু কৃতার্থ হইবেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে যাই। আর পুণ্ডরীক শাপের ফলেই তোমার আশ্রমে যখন চন্দ্রপীড় বিগতপ্রাণ হয়েন, তাহার পরই আমি অচ্ছোদ সরোবরে প্রবেশ করিয়া অশ্বদেহ ত্যাগ করিয়া স্বদেহ প্রাপ্ত হই। এক্ষণে তোমার সখী কাদম্বরীও পতিদেহ রক্ষা করিতেছেন, করুন। চন্দ্রাপীড় পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইয়া কাদম্বরীলাভে সমর্থ হইবেন।"

দেখিতে দেখিতে কপিঞ্জল শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তখন মহাশ্বেতা পুণ্ডরীক উদ্দেশ্যে করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "নির্ম্মলস্বভাব ঋষিকুমার এই হতভাগিনী পাপীয়সী মহাশ্বেতার জন্যই আজ পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার জন্যই তাঁহাকে নিদারুণ কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল, আমার জন্যই তাঁহাকে বৈশম্পায়ন জন্মে ঐরূপ অন্ধ উন্মত্তবৎ হইতে হইল। আমার জন্যই শোচনীয় অভিশপ্ত মৃত্যুকে আবার আলিঙ্গন করিতে হইল। পাপিষ্ঠা মহাশ্বেতাকে তিনি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারেন নাই, আর আমি তাঁহার কি দুর্দ্দশাই না করিলাম। আমার জন্য উহাকে কত দুরবস্থায় পড়িতে হইল। হায়, কঠিনপ্রাণা আমি, আমার ত মৃত্যু হইল না।"

চন্দ্রাপীড় শাপের অলঙ্ঘ্যতার ফলে দেহত্যাগ করিয়া শূদ্রক নামে নরপতি হইলেন। কাদম্বরীগত প্রাণ চন্দ্রাপীড়ের শূদ্রক জন্মে ও রমণী সম্ভোগ লালসা একেবারেই জন্মে নাই। পুত্রবিপৎকাতরা স্নেহময়ী জননী লক্ষ্মী দেবী চণ্ডাল কন্যারূপে শুকপক্ষীরূপী বৈশম্পায়নকে শূদ্রক রাজার সভাতলে লইয়া গেলেন। সেই স্থানেই শাপ বিমোচন ঘটিবে, এই ভরসায় লক্ষ্মী দেবীকে চণ্ডাল কন্যার বেশে রাজসভাতলে যাইতে হইল। শুকপক্ষীকে মানবী ভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া শূদ্রক তাহাকে রাজসভায় বসাইলেন, তাহার অতীত-বৃত্তান্ত-শ্রবণ-লোলুপ সভাসৎ সমক্ষে জীবনেতিহাস বর্ণনা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। শুকপক্ষী যেমন তাহার জীবনী শেষ করিল, অমনি শূদ্রকের অন্তঃকরণে পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতি স্পষ্টই জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাজা শূদ্রকের প্রাণত্যাগ ঘটিল, শুকপক্ষীর প্রাণশূন্যদেহ ও পিঞ্জর মধ্যে পড়িয়া রহিল। চণ্ডালকন্যারূপিণী লক্ষ্মী দেবীও অন্তর্হিতা হইলেন।

বসন্তকালে মধুমাসে কাদম্বরী মৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া অজস্র রোদন করিতেছেন তৃষ্ণাতরল চক্ষু দুইটী পতি মুখে সংলগ্ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে নবীন মলয় বাতাসের আকর্ষণে কামবিহ্বলা, প্রেমোন্মত্তা কাদম্বরী-কর্ত্তৃক চন্দ্রাপীড়ের মৃত দেহ গাঢ় আলিঙ্গিতা হইল। কাদম্বরীর সেই সজীব উন্মাদক মৃতসঞ্জীবনস্পর্শেই যেন মৃতদেহে প্রাণ আসিল। চন্দ্রাপীড় নিমীলিত চক্ষু চাহিয়া দেখেন, কাদম্বরীর আলিঙ্গনে তিনি নিবদ্ধ। "ভগবন্ এ সুখস্বপ্ন যেন বৃথা হয় না।" তখন দুইজনে পরস্পর আলিঙ্গন বদ্ধ নিস্পন্দ—এমন সময়ে পুণ্ডরীক কপিঞ্জলের হাত ধরিয়া আকাশ পথ দিয়া নামিতেছেন। মহাশ্বেতার-অন্ধকারময় জীবনে নবজ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল। তখনই সচকিতে কাদম্বরী মহাশ্বেতা কণ্ঠ লগ্না হইয়া আপনার সুখের মধ্য দিয়া সখীর সুখ সজীবভাবে অনুভব করিলেন। পুণ্ডরীক আসিবামাত্র চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে কঠোর সাধনা মূর্ত্তিমতী দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

মহর্ষি শ্বেতকেতু বলিয়া পাঠাইলেন যে, বৈশম্পায়নবোধে পুণ্ডরীককেই যেন 'শুকনাশ' পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বিদিতসকলবৃত্তান্ত লোকগণ বৈশম্পায়নের সত্তাই পুণ্ডরীকের সত্তার ভিতর প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। বলাই বাহুল্য, পুণ্ডরীকের সহিত মহাশ্বেতা, চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরী পরিণীতা হইলেন। তারাপীড়, বিলাসবতী, শুকনাশ ও তৎপত্নী, চিত্ররথ ও মদিরা, হংস ও গৌরী প্রভৃতি সকলে আসিয়াই বিবাহ কার্য্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন করিলেন। উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল; আমোদের উচ্ছ্বাস মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিল। কতকাল অতৃপ্ত চারিটি প্রাণীর মুখে আজ হাসি দেখা দিল।* শাপভ্রষ্টা 'রোহিণী' তাঁহার অলৌকিক স্বার্থত্যাগ নিজের জীবনে পরিস্ফুট করিয়া 'পত্রলেখা' জীবনে ও তাহার প্রতিবিম্ব মর্ত্ত্যে রাখিয়া গেলেন।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

ব্রাহ্মণ। শ্রী

(১)

জীর্ণ,শীর্ণ বর্ণাশ্রম নিলয়—ভারতে,
সংস্কার সাধনে পুনঃ অতীত সুষমা;
ফুটাইতে তুমি মাত্র আছ এ জগতে,
অতুলিত শক্তিধর! তাই ডাকি তোমা॥

(২)

প্রমোদ মদিরা পানে লভিয়া বিকার,
ভুলিয়া রয়েছ তুমি আপনার বল।
ভোলেনি ভারত কিন্তু সে শক্তি তোমার—
বর্ণাশ্রম রক্ষণের সে পূত কৌশল।

(৩)

তাই তব পদরেণু চুমি অনিবার,
ডাকে ওহে মহাশিল্পি! ত্যজিয়া আরাম;
অনাচার ঝটিকায় বিকৃত আকার,—
সংস্কার আশ্রম গৃহ, রাখ নিজনাম॥

* মহাশ্বেতার জীবনী সংশ্লিষ্ট বলিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে কাদম্বরী জীবনী বিবৃত করিতে হইল॥

(৪)

দশবিধ সংস্কার পদ্ধতি লিখিত,
　　এখনও আছে এই বর্ণাশ্রমাবাসে।
না বুঝি প্রণালী তার একাল শিক্ষিত
　　বাতুল প্রলাপ বলি মুহুর্মুহুঃ হাসে

(৫)

সে দশ সংস্কার গুণ এ বিশ্বমাঝারে,
　　তুমি বিনা বুঝাইতে পারে কোন জন।
তাই হিন্দু-প্রাণ তোমা ডাকে সকাতরে,
　　সংস্কার প্রণালী শীঘ্র দেখাও ব্রাহ্মণ ॥

(৬)

তব প্রদর্শিত সেই প্রাচীন পদ্ধতি,
　　বিধিমতে অনুষ্ঠিত হইলে আবার।
বর্ণাশ্রমালয়ে পুনঃ অতীত বিভূতি,
　　জাগিয়া উঠিবে নাশি যত অনাচার ॥

(৭)

ভারত ভূস্বর্গ বলি হইবে কীর্ত্তিত,
　　শ্মশানে নন্দন বন প্রতিষ্ঠিত হবে।
রবেনা অকালমৃত্যু, না রবে পীড়িত—
　　ত্রিবিধ পীড়ায় এই বর্ণাশ্রমি-জীবে ॥

(৮)

ওঙ্কার ঝঙ্কারে মুগ্ধ হবে চরাচর,
　　বিষাদ আঁধার আর রবে না হেথায়।
সামস্বর প্রভাকর কিরণে আবার
　　আর্য্য চিত্ত সরসিজ ফুটিবে ধরায় ॥

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি।

উত্থান ও পতন।

(দ্বিতীয় প্রসঙ্গ)

প্রথম-প্রসঙ্গে উত্থান পতনের আলোচনা সমষ্টিভাবেই করা হইয়াছে; ব্যষ্টিভাবে করিতে হইলে মনুষ্যের জন্ম, প্রবৃত্তি ও শক্তি কিরূপ, এবং কি প্রকারে সেই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; তাহাই সমালোচ্য, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফললব্ধ দেহধারী মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃ সংসারী। সংসারে প্রবেশ করিয়াই মনুষ্য হৃদয়ে কামনার উদ্রেক হয়, এবং এই কামনা যতই প্রবল হইতে থাকে, ততই মনুষ্য সত্যপথে না যাইয়া পাপ পথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই নৈয়ায়িকগণের মতে সংসার শব্দের অর্থ "মিথ্যা-জ্ঞান-জন্য বাসনা।" স্থূলদর্শীর পক্ষে এই অর্থ সমীচীন না হইলেও সূক্ষ্মদর্শীরা ইহাই সংসার শব্দের সদর্থ বিবেচনা করেন। প্রথমতঃ জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্ম হইতেই জন্মের ইতর বিশেষ হয়। পরে মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মনুষ্য বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হয়, এবং পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া তাহার আত্মীয়—পর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সত্য মিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকেনা। ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধির সহিত তাহার অনুভব শক্তি ও কামনা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সে চতুষ্পার্শ্বে যাহা কিছু দর্শন করে, বা যাহা কিছু শ্রবণ করে, তাহাই শিক্ষা করে; এবং এই শিক্ষার গুণে অনেক সময়ে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া সে ভালকেও মন্দ এবং মন্দকেও ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই প্রকার বারবার করিতে করিতেই অভ্যাস, এবং অভ্যাসই তজ্জন্মার্জ্জিত সংস্কারে পরিণত হয়। এই সংস্কার দুষ্ট হইলেই জ্ঞানি-জনে কুসংস্কার বলিয়া থাকেন। ইহা একবার মনুষ্য হৃদয়ে বদ্ধমূল ও পল্লবিত হইলে, তাহাকে উৎপাটিত করা বড়ই কঠিন। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত কোন কোন দিকে অঙ্গচ্ছেদ হইলেও, তাহার আমূল পরিবর্ত্তন এক প্রকার অসম্ভব। এইরূপে পরিবর্দ্ধমান মনুষ্য আপন চিত্তকে সংস্কাররূপ এক প্রকার কঠিন আবরণে আবৃত করে, এবং তখন সেই চিত্ত, অন্তর্নিহিত মহাশক্তি সত্ত্বেও, গুটিপোকার মত আবরণ মধ্যস্থ থাকিয়া আপনশক্তির কিছুমাত্র পরিচয় দিতে পারে না। জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী সুপরিচালিত আয়াসফলে মনুষ্য এই আবরণ ছেদ করিয়া দিতে সমর্থ হইলেও, অর্জ্জিত কুসংস্কার গুলি সেই জীবনে তাহার একটি অপরিহার্য্যগুণ বিশেষ হইয়া উঠে, এবং ইহা চিত্তের সহিত এরূপ ক্লিপ্ত হয় যে দেহ ভস্মীভূত হইলেও তাহার চিত্ত সংস্কারচ্যুত হইতে পারে না। সঞ্চরণশীল বায়ুর পুষ্পাদি হইতে গন্ধবহনের মত, জীবাত্মা দেহ হইতে নির্গমন কালে মনুষ্যর চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া নূতন দেহে লইয়া যায়। সুতরাং এই কলুষিত চিত্ত পরজন্মেও দেহীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ইহাকেই আমরা মনুষ্যের স্বভাব বলি, এবং এই স্বভাবানুসারেই মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও কর্ম্মানুষ্ঠান। অতএব প্রতিপন্ন হইল, কর্ম্ম ও কর্ম্মাসক্তি প্রবৃত্তি মূলক মাত্র।

কর্ম্ম ও কর্ম্মাসক্তি প্রবৃত্তিমূলক হইলেও সুখভোগই মনুষ্যের লক্ষ্য, দুঃখভোগ কখনই তাহার লক্ষ্য নহে। অপর পক্ষে, সুখ এবং দুঃখ উভয়ই মনের দ্বারা অনুভবনীয় হইলেও আত্মধর্ম্ম নহে। আত্মধর্ম্ম না হইলেও ধর্ম্ম হইতে সুখের এবং অধর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুখ দুঃখের জন্য কারণ গুলি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও, দুঃখের ছায়ামাত্র দেখিলেই মনুষ্য তাহা পরিহার করে। প্রকৃতিগত এইরূপ হইলেও সচরাচর মনুষ্যকে দুঃখের পথেই বিচরণ করিতে দেখা যায়। এই অস্বাভাবিক কার্য্যের একমাত্র কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত চিত্তমালিন্য এবং তজ্জনিত ঘোর অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতাবশতই সুখ দুঃখের প্রকৃত কারণগুলির সম্যক উপলব্ধি করণে মনুষ্য অসমর্থ হয়, এবং সুখের পথ দুঃখের, ও দুঃখের পথ সুখের বলিয়া গ্রহণ করে। আমাদের শাস্ত্রে দ্বিবিধ সুখের কথা উল্লিখিত আছে—"নিত্য" ও "জন্য" নিত্যসুখ পরমাত্মার একটী বিশেষ গুণ, এবং ইহার একটি বিশেষ ধর্ম্মও বটে। এই সুখের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিতে পারিলেই মানবজন্ম সার্থক হয়; কিন্তু এরূপ শক্তিমান পুরুষ অল্পই জন্মিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ, শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মগণ নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে বহুজন্মের তপস্যা ব'লেই তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষু সম্যক প্রস্ফুটিত হওয়াতেই তাঁহারা এরূপ পারিয়াছিলেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব। সাধারণ মনুষ্য কেবল মাত্র জন্য সুখের অধিকারী হইতে পারে। ইহাও ত্রিবিধ। প্রথম সাত্ত্বিক; আত্মপ্রসাদনই ইহার লক্ষ্য, এবং ইহাতেই আত্মার পরিতৃপ্তি। বাহ্যেন্দ্রিয় বা রিপুগণের তৃপ্তি সাধনের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই। এই সুখ পাইতে হইলে প্রাণীর পীড়াদায়ক কোন কার্য্যই করিতে হয় না এবং শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ শ্রদ্ধার সহিত পালন করিতে হয়। প্রথমাবস্থায় কষ্টকর হইলেও, পরিণামে ইহা অমৃতোপম হয়। নিষিদ্ধকার্য্যবর্জ্জন পূর্ব্বক বৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রকাশ হয় তাদৃশ সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সাত্ত্বিকীবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত কার্য্য হইতেই সাত্ত্বিকসুখের উৎপত্তি। দ্বিতীয় প্রকারের সুখ—রাজসিক। পার্থিববিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগে ইহার উৎপত্তি। সুতরাং অধিকাংশস্থলে ইহা প্রাণীর পীড়াদায়ক হয়, এবং ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়েরই পরিতৃপ্তি হয়। স্থূলদৃষ্টিতে ইহা সুখের বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতই ইহা দুঃখের অবস্থা। এই জন্য প্রথমে ইহা অমৃতোপম হইলেও পরিণামে বিষবৎ হইয়া উঠে। ইহা আত্মোন্নতির প্রতিষেধক এবং পতনের পূর্ব্বাভাষ। মনুষ্য চেষ্টা করিলে এই অবস্থা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যিনি এইরূপ সুখে প্রমত্ত হয়েন, তাঁহাকেই সুখের তৃতীয়—অর্থাৎ জঘন্য তামসিক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। তামসিকসুখ ঘোর অজ্ঞানতার ফল, এবং নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ ইহার নিত্য সহচর। এই অবস্থায় রিপুগণ সম্পূর্ণ প্রবল হয়। রাজসিক সুখের অবস্থায় মানুষের বরং কথঞ্চিৎ দূরদৃষ্টি থাকে, তামসিক সুখের অবস্থায় তাহার চিত্ত ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতেও চাহেনা, কর্ম্মের ফলাফল এবং বস্তুও বিষয়ের কার্য্য কারণ ভাবও বুঝেনা, এবং পাপানু-

ষ্টানেও বিচলিত হয়না। তাহার কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি পাপাচরণে উল্লসিত, এবং অন্তরিন্দ্রিয় গুলি ব্যথিত ও জড়াবস্থ। বলা বাহুল্য এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—পাপ ও পতন। বর্ত্তমান কালে আমরা অনেকেই এই তৃতীয়শ্রেণী সুখের প্রয়াসী হইয়া, আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিবসে—কেহ অল্পমাত্রায়, কেহ বা বহুমাত্রায়—সত্যভ্রষ্ট হইতেছি; দেহধ্বংশের সহিত জীবলীলার শেষ, এবং ঐহিক ভোগ সুখই পুরুষার্থ, এই ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিত্য নানা প্রকার অকার্য্য করিতেছি; অধিকন্তু এই সকল অকার্য্য সঙ্গোপনে করিতে পারিলেই আপনাকে বিজয়ী মনে করিতেছি, এবং এইরূপ বিজয় সংবাদে এক প্রকার প্রসন্নতাও অনুভব করিতেছি। বিচারশক্তি বিলুপ্ত হওয়ায়, ইন্দ্রিয় পরিতোষকেই—আত্মার পরিতোষ বলিয়া মনে করিতেছি এবং আত্মগ্লানি অনুভব করিতে পারিতেছিনা। আত্মসেবা বিস্মৃত হইয়া শরীরসেবাই আমাদের লক্ষ্য হইয়াছে; এবং এই আসুরভাবের মোহান্ধকারে পড়িয়া আমরা এরূপ জ্ঞানশূন্য ও অন্তর্দৃষ্টি হীন হইতেছি যে এই পতনকেই উত্থান মনে করিয়া পরস্পর পরস্পরের গুণ কীর্ত্তনও বিজয় ঘোষণা করিতেছি।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ সুখ দুঃখের স্থূললক্ষণ বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"—অর্থাৎ আত্মনির্ভরতাই সুখ এবং পরমুখাপেক্ষিতাই দুঃখ। আমরা কিন্তু ইহার, বিপরীতই বুঝিয়া থাকি, বাল্যকাল হইতেই দেহধারণ জন্য অনেক বিষয়েই আমরা পরমুখাপেক্ষী হইতে শিখিতেছি। আপন আপন হস্ত পদাদির বলে আমরা যে সকল অভাব দূরীকরণে সমর্থ,তাহা অপর কোন ব্যক্তিদ্বারা সম্পন্ন করাইয়া সুখ এবং স্বয়ং সম্পাদনে দুঃখ বোধ করিতেছি ফলতঃ আমাদের সমাজ মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতা বিশেষ বিস্তৃত ভাবেই প্রবেশ করিয়াছে, এবং ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকলেই অপরের দ্বারা আপন আপন কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। একটু অনুধাবন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অভিমান এই বিসদৃশ বোধের উৎপাদক। এরূপ ব্যবস্থার অনুকূল পক্ষগণ ইহাকে অভিমান না বলিয়া 'আত্মসম্মান' বলিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখা যাউক আত্মসম্মান কাহাকে বলে, এবং আমার কার্য্য আমি স্বয়ং সম্পন্ন করিলে আমার আত্মসম্মান নষ্ট হয় কি না। আত্মসম্মান কথার অর্থ—'আত্মার সমাদর'। চিত্তই এস্থলে আত্মা—সেই চিত্ত বা আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টাই তৎপ্রতি সমাদর প্রদর্শন। জঘন্য বৃত্তিসমূহের পরিচালনা দ্বারা আত্মাকে সম্যক প্রকারে ব্যথিত ও উৎপীড়িত করিলে আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় না বরং আত্মকে অবজ্ঞাই করা হয়। আমি স্বকীয় আত্মাকে সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্বতোভাবে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত করিলেও, অপরে আমাকে অর্থাৎ আমার আত্মাকে সমধিক সম্মান করিবে, এরূপ আশা দুরাশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে! আত্মসম্মান একটি মহৈশ্বর্য্য। বহুমূল্য রত্নরাজিও ইহার নিকট নিষ্প্রভ। যাঁহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি কখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় বা যোগ দিতে পারেন না, তাঁহার চিত্ত উদারতাময়, এবং তিনি কাঁহারও নিকট, সম্মান পাইবার ভিখারী হয়েন না, অমুক ব্যক্তি আমাকে অসম্মান করিল এ কথাও

মুখে আনেন না। চুম্বকের লৌহাকর্ষণ মত সম্মান স্বতঃই তাঁহাতে আকর্ষিত ও লিপ্ত হয়। অপর পক্ষে অভিমান এক প্রকার দর্প; ইহা ক্ষুদ্র ও তমসাবৃত চিত্তের লক্ষণ। অভিমানী ব্যক্তির আত্মা প্রভাহীন; সুতরাং নিজে নিষ্প্রভ হইয়া কৃত্রিম আলোকে দীপ্তিমান হইবার ইচ্ছা তাহার বলবতী হয়; বাহ্যসৌন্দর্যে অন্তরের ক্লেদ, এবং পার্থিবধনের প্রভাবে আপন গুণ হীনতা সঙ্গোপন করিতে ব্যগ্রতা জন্মে। রত্নরাজি জ্যোতিবিশিষ্ট হইলেও, তাহার আধার বা অধিকারী কখনই জ্যোতিষ্মান্ হয় না। ধনের সম্মান সংসারে চিরকালেই আছে, এবং চিরকালই থাকিবে; কিন্তু ইহা ধনের সদ্ব্যবহারেই সন্নিবদ্ধ। ধন ও মান লইয়াই সংসার। আমাদের শাস্ত্রে বলে অধম প্রকৃতির লোক কেবল ধনাকাঙ্ক্ষী; মধ্যম প্রকৃতির লোক ধন ও মান উভয়ই প্রার্থনা করেন; কিন্তু উত্তম প্রকৃতির লোক কল্যাণকেই মহাধন বলিয়া জানেন এবং আত্মসম্মান সুদৃঢ় রাখিয়া বহিঃ সম্মান আকর্ষণ করেন।

আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপন উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই মনুষ্য প্রকৃতই উন্নত হয়। এই উন্নতি দ্বিবিধ—সংসারিক ও আধ্যাত্মিক। উন্নতির এই দ্বিবিধপথই মনুষ্যের পক্ষে প্রশস্ত হইলেও একই সময়ে কেহই এই দুই পথের পথিক হইতে পারেনা। সংসারিক উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইবে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ ততই তোমাহইতে দূরে পড়িবে। এবং অপর পক্ষে অধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যাইবা মাত্র তোমার সাংসারিক উন্নতির পথ রোধ হইবে। এই দুইএর সামঞ্জস্য এক প্রকার অসম্ভব। প্রাচীন আর্য্যসমাজে এই জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। তাঁহারাই 'ব্রাহ্মণ'। সংসারিক উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ, তাঁহাদের কর্ম্মভেদে, তিন ভাগে, বিভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ এই তিন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের নেতা এবং উপদেষ্টা। আজন্ম পূতাচারী, অধ্যয়নশীল, পরার্থ পরায়ণ—'ব্রাহ্মণ' সমাজের গুরু। তাঁহারা সম্মানের ভিখারী ছিলেন না; সম্মান স্বতঃই তাঁহাদিগের অনুগমন করিত। পার্থিব ভোগসুখে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হইয়া জগতের মঙ্গল সাধনার্থ যে সকল ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ নীতি এবং রাজনীতি তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি জগতে অতুলনীয়! পরোপকার তাঁহাদের জীবনের ব্রত এবং আত্মার উন্নতি সাধন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। সেই আদর্শ ব্রাহ্মণসমাজের অবনতির সহিত ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের পতন হইয়াছে।

তৎপরে সংসারিক উন্নতির কথা। কিরূপ আকৃতি বিশিষ্ট পুরুষ সংসারে উন্নতিশীল হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"পঞ্চদীর্ঘং চতুর্হ্রস্বং পঞ্চসূক্ষ্মং ষড়ুন্নতং।
সপ্তরক্তং ত্রিগম্ভীরং ত্রিবিশালং প্রশংসাতে।"

অর্থাৎ—বাহু, নেত্র, কুক্ষী, নাসা, এবং স্তনমধ্যবর্ত্তী স্থান দীর্ঘ; গ্রীবা, কর্ণ, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব; আঙ্গুলি পর্ব্ব, দন্ত, কেশ, নখ, ও ত্বক্ সূক্ষ্ম; নাসা, নেত্র, দন্ত, ললাট, শিরঃ, ও হৃদয় উন্নত; করতল, পাদতল, নেত্র, অন্তর—নখ, তালু, অধর ও জিহ্বা রক্তবর্ণ; স্বর, বুদ্ধি ও নাভি গম্ভীর; এবং উরঃ, শিরঃ ও ললাট বিশাল হওয়া আবশ্যক। একাধারে এই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকা অসম্ভব না হইলেও দুর্লভ। তবে ইহার মধ্যে কোন

কোন লক্ষণ পুরুষে লক্ষিত হইলেই তাহাতে সংসারিক কোন কোন বিষয়ের উন্নতি সূচিত হয়। তবে এই লক্ষণগুলি উন্নতির সূচনা মাত্র। বীজ যেমন জলসেচন দ্বারা অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বর্দ্ধিত ও অবশেষে ফল ফুল শোভিত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে জন্মাবধি এইরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত হইলেও কেবলমাত্র পুরুষকার দ্বারা ফললাভ সম্ভবে না। নতুবা উষর ক্ষেত্রে বীজ বপনের মত—সুলক্ষণাক্রান্ত হইলেও ফললাভ হয় না। সুলক্ষণাক্রান্ত পুরুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও মনুষ্য মাত্রকেই জীবশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াই মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পদবাচ্য হইতে পারে না। পৃথিবীতে কত মনুষ্য পশুবৎ বা ততোধিক ঘৃণিত আচরণে মনুষ্য নাম কলঙ্কিত করিতেছে। "অমুকের পুত্র মানুষ হইয়াছে" এরূপ উক্তি আমরা স্ত্রীপুরুষ সকলের নিকট নিত্য শুনিতে পাইলেও, বাক্যটি অতি সারবান্। "মানুষ হইলেই" মনুষ্যোচিত কতকগুলি গুণসম্পন্ন হইতে হয়। এই গুণ কেবল অর্থোপার্জ্জনে সীমাবদ্ধ নহে। অর্জ্জিত অর্থ প্রাণিবর্গের উপকার-সাধানার্থ বিনিয়োগ, আত্মরক্ষা পূর্ব্বক কায়-মনো-বাক্যে যথাশক্তি সমাজের রক্ষণ ও পালন, এবম্প্রকার কর্ম্মদ্বারা সংসারিক উন্নতি হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ পতিত বা পতনোন্মুখে হওয়ায় কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জন-শীল ব্যক্তিকেই আমরা "মানুষ" বলিয়া থাকি, এবং সমাজে উচ্চাসন দিয়া থাকি। এতদ্দ্বারা সংসারে অর্থের প্রয়োজনা-ভাব কেহ যেন না বুঝেন। অর্থই সমাজের বল, এবং অর্থই জীবন ধারণোপায়। আমাদের শাস্ত্রে কহে "সা শ্রীর্দানমদং কুর্য্যাৎ।" শ্রীমান ব্যক্তি কোমল প্রকৃতি ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইলে প্রকৃতই শ্রীমান হয়। কিন্তু ধনীর কল্পিত গুণ কীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ হইয়া আমরা তাহার চিত্তে মত্ততা আনয়ন করি, এবং তাহার, দোষগুলি তাহাকে দেখিতে দেই না। এই-রূপে ধনবান ব্যক্তি দুরাত্মা হইয়াও আপনাকে মহাত্মা বলিয়া মনে করেন। গুণের মর্য্যাদা হ্রাস করিয়া অর্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করাই তামসিকতার পরিচয়। তামসিকতাই অজ্ঞানতা, অজ্ঞানতাই পাপ, এবং পাপই পতন।

এক্ষণে মনুষ্যের শক্তির কথা আলোচনা করা যাউক। এই শক্তি ত্রিবিধ, প্রথম প্রভাব শক্তি; প্রভুত্ব হইতেই এই শক্তির উৎপত্তি, এবং প্রভুত্বের উপাদানও বিবিধ। ধনবল, জনবল, জ্ঞানবল, বংশ-মর্য্যাদা-বল, এ সমস্তই প্রভাব শক্তি। প্রভুত্ব ধর্ম্মভাবে পরিচালিত হইলেই প্রভুশক্তি অক্ষুন্ন থাকে। সম্রাট হইতে ক্ষুদ্র গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেরই কিছু না কিছু প্রভুত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু প্রভুত্বের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হউক আর বৃহৎই হউক, প্রভুত্ব পরিচালনার স্থূল নিয়ম একই—অর্থাৎ অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, তাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও সাধ্যমত উন্নতি সম্পা-দন। দ্বিতীয়—উৎসাহ শক্তি। অধ্যবসায় দ্বারা অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশকেই উৎসাহ শক্তি বলে। উৎসাহবলে নিষ্প্রভ শক্তি-গুলিও প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং তদভাবে বিকাশোন্মুখ গুণসকল নিস্তেজ, হীনবীর্য্য ও কার্য্যাক্ষম হয়। উৎসাহহীন মনুষ্য উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সত্ত্বেও সমাজের নিম্নস্থান অধিকার করেন, এবং সমাজের কোন প্রকার হিতকর কার্য্যের সহায়তায় অসমর্থ হন। তৃতীয়—মন্ত্রজ শক্তি। সদ্গুরু হইতে প্রাপ্ত সুসংস্কৃত মন্ত্রের সুসাধনায় ইহার

উৎপত্তি। মন্ত্রজ শক্তি, আত্মোন্নতির মূল ও আত্মোন্নতির অর্থ—দেহ, বুদ্ধি, মন, প্রাণ সম্বলিত আত্মাকে সর্ব্বপ্রকার পীড়া হইতে উদ্ধার করণ। আত্মা ব্যাধিশূন্য হইলেই মোহ বর্জ্জিত এবং পরমানন্দ সংযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এইরূপ উন্নতিশীল ব্যক্তি বর্ত্তমান কালে সুদুর্লভ হইলেও, বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরানিক কালে ভারতবর্ষে ইঁহার অভাব ছিল না। সাংসারিক উন্নতি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অতীন্দ্রিয়শক্তিবলে সংসারের উন্নতি সাধনে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন না। আত্মোন্নতির অবনতির সহিত মন্ত্রশক্তির কুব্যবহার আরম্ভ হইল, এবং মন্ত্রবলে অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন একশ্রেণী লোকের উপজীবিকা হইয়া উঠিল। মন্ত্রশক্তি এইরূপে অসদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়াতেই ক্রমে ইহা নিষ্প্রভ, জনবর্গের নিকট অনাদর এবং বিলুপ্ত হইল। অধিক কি, এরূপ শক্তি কেবল মাত্র কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস। তর্ক বা প্রমাণাদিদ্বারা সেই বিশ্বাস খণ্ডন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ফলতঃ মন্ত্রশক্তির অভাবে আত্মোন্নতির গতি রোধ হইলেও, সাংসারিক উন্নতির গতি রোধ হইবার কথা নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় আর্য্য অধিবাসিগণ কোন বিষয়েই পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশস্থ সভ্য জাতিগণের সমকক্ষ নহেন। উৎসাহশক্তির অভাবই তাহার একমাত্র কারণ, উৎসাহ শক্তিই পুরুষকার ও প্রভাবশক্তির উৎপাদক। যেস্থলে উৎসাহশক্তি নাই তথায় পুরুষকার বা প্রভুত্ব থাকিতে পারে না। প্রভাব শক্তি পাইতে হইলে উৎসাহশক্তির আবাহন করিতে হয়। এই আবাহনে বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই, অধিকার ভেদও নাই, কালাকালও নাই। ইহা মনের ধর্ম্ম, এবং ইহার উদ্দীপন কেবল আত্মপ্রযত্ন সাপেক্ষ। উৎসাহবৃত্তি বিস্ফুরিত করিতে পারিলে, সহস্র বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মনুষ্য আপন অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। পতিত মনুষ্য বা মনুষ্য সমাজের উন্নত হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। পতিতকে উদ্ধার করাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি শক্তি ও বৃত্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছেন। আমরা সেই শক্তি ও মনোবৃত্তির কুব্যবহার দ্বারা যদি আরও অধঃপতিত হই সে দোষ আমাদের—ঈশ্বরের নহে। শক্তি ও মনোবৃত্তি সুপরিচালিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় আচারপরায়ণ হইয়া ভক্তিদ্বারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপা, অনন্তবীর্য্যা, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে, এবং কোটী কোটী কণ্ঠে সমস্বরে বলিতে হইবে।

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥"

শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীগুরু-শিষ্য সংবাদ।

অশৌচ শঙ্কর।

শিষ্য—গুরুদেব! একণে একটী অশৌচের মধ্য অপর অশৌচ প'ড়িলে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে—জানিতে ইচ্ছা করি। মধ্যে মধ্যে যুক্তি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

গুরু—বৎস! একটী অশৌচের মধ্যে অপর অশৌচ প'ড়িলে তাহাকে অশৌচশঙ্কর বলে। শঙ্কর অতি জটিল। আমার কথায় সন্দেহ হইলে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিবে। আমিও তাহার উত্তর অতিবিস্তৃত ভাবে দিব। কথায় কথায় যুক্তি দেখাইতে হইলে অযথা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে। ফলকথা—তুমি যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে—যথামতি যুক্তি প্রদর্শন করিব।

শিষ্য—তাত! আপনি যুক্তির কথা বলিলে যেন বিরক্ত হন। ঋষিরা কি বিনা যুক্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? কিছুই যুক্তি ছাড়া লিপিবদ্ধ হয় নাই, ইহাই আমার ধারণা।

গুরু—তাত! তোমার কথা ঠিক ও বটে, অঠিক ও বটে। তাঁহারা অযুক্ত কিছু বলেন নাই, ইহা ঠিক। তাঁহারা অনেক কথা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাই আমার ধারণা। আমরা তাহার যুক্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া—অপযুক্তির আশ্রয় ও গ্রহণ করি। সেই কারণে আমি যুক্তির পক্ষপাতী নই। তথাপি কালানুসারে যুক্তির উল্লেখ করিতে উদাসীন হইব না।

শিষ্য—পিতঃ! অশৌচশঙ্করের আর কি প্রত্যক্ষ করিবেন?

গুরু—বৎস! সে কথা পরে বলিব, আদৌ অশৌচ শঙ্করের কথা বলি। অশৌচ শঙ্করের প্রস্তাবের পূর্ব্বে একটী কথা বলি—আমরা নিরগ্নি, আমাদের মরণের পর অশৌচ হয়, যাঁহারা সাগ্নি, তাহাদের শবদাহের পর অশৌচ হয়। অশৌচ না জানিলে অশৌচ হয় না। তবে অশৌচ হওয়ার যোগ্যতা হয়। স্বল্প কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাশ, অতীসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশ ইত্যাদি রোগী মহাপাতকী ও বৃহৎ কুষ্ঠ, অর্শপ্রভৃতিরোগযুক্ত অতিপাতকী, ইহারা প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে অশৌচ জন্মাইতে পারে না। অর্থাৎ ইহাদের মরণে অশৌচাদি হয় না। এবং ঐহিক মহাপাতকীপ্রভৃতির মরণে অশৌচ হয় না। কিন্তু ইহাদের উত্তরাধিকারিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে ও অশৌচ হয়। যাহাদের অশৌচের অনুভব করিবার শক্তি হয় নাই, এরূপ শিশুর অশৌচ হয় না। প্রসূতির অশৌচ সত্ত্বে তাহাদের সংসর্গে থাকিলেও শিশুর অশৌচ হয় না। তাই শুচি ব্যক্তি অশৌচকাল মধ্যে প্রসূত সন্তানের সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই ব'লিয়াছি—অশৌচ দুই প্রকার কালনাশ্য ও ক্রিয়ানাশ্য। কালনাশ্য অশৌচের মধ্যে অশৌচান্তর হইলে শঙ্কর হয়। এক সময়ে অনেক অশৌচ পাতে গুরু অশৌচে লঘু অশৌচ নষ্ট হয়। এই গুরুত্ব কালগত ও ক্রিয়াদিগত। স্বজাত্যুক্ত অশৌচ—ত্রিরাত্রাদি অশৌচ অপেক্ষা কালে গুরু। সুতরাং স্বজাত্যুক্তাশৌচে ত্রিরাত্রাদি অশৌচ নষ্ট হয়। সপিণ্ডমরণাশৌচ অপেক্ষা পিতা মাতা ও ভর্ত্তার মরণাশৌচ গুরু। কেননা পিতা ও মাতা

পুত্রের, এবং ভর্ত্তা স্ত্রীর মহাগুরু। এইরূপ মহাগুরু মরণাশৌচকে "অধবৃদ্ধিমদাশৌচ" বলা হইয়াছে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এরূপ মহাগুরু মরণে অক্ষারলবণ ভোজন করিতে হয়; সুতরাং সপিণ্ডাশৌচ অপেক্ষা মহাগুরুর মরণাশৌচ গুরু। তাই সপিণ্ডাশৌচ—পিতা মাতা ও ভর্ত্তার মরণাশৌচের ক্রিয়াগত গুরুত্ব বশতঃ যায়; কিন্তু মহাগুরুর মরণাশৌচ সপিণ্ড মরণাশৌচে যায় না। কিন্তু যদি সপিণ্ডাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে মহাগুরু নিপাত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচে পরাশৌচের অন্ত হইবে—অর্থাৎ সেখানে মহাগুরুমরণাশৌচ স্বাবধি হইবে না। সপিণ্ডমরণাশৌচের অন্তে তাহার অন্ত হইবে এবং উভয়েরই শ্রাদ্ধ একদিনে হইবে। কিন্তু সপিণ্ডাশৌচের পরার্দ্ধে অধবৃদ্ধিমদাশৌচ হইলে স্বাবধি দশাহাশৌচ হইবে। কথাটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি।—ব্রাহ্মণের ১০ দিন অশৌচ। কোন একটী সপিণ্ডমরণের দশাহাশৌচের ৫ দিনের মধ্যে পিত্রাদি মহাগুরুর মরণ হয়, তাহা হইলে পিত্রাদি মরণে আর পৃথক্ অশৌচ হইবে না। পূর্ব্বাশৌচে পরাশৌচ যাইবে। কিন্তু পূর্ব্বাশৌচের ৬ দিন হইতে ১০ দিনের মধ্যে পিত্রাদির মরণ হইলে পিত্রাদি মরণ দিন হইতে ১০ দিন অশৌচ হইবে। শঙ্কর স্থলে কখন কখন পূর্ব্বাশৌচ বাড়িয়া যায়, কখন কখন পরাশৌচ কমিয়া যায়। উভয়াশৌচ ঠিক থাকিবে না—ইহা নিশ্চিত।

সমকালীন জনন মরণাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ গুরু; অতএব সপিণ্ডমরণাশৌচে সপিণ্ড জননাশৌচ যায়। মরণাশৌচের গুরুত্ব ও ক্রিয়াগত। মরণাশৌচে অস্পৃশ্যত্ব ও অক্ষারলবণাদ্যাশিত্ব আছে, জননাশৌচে তাহার কিছু নাই, সুতরাং মরণাশৌচ গুরু। পাপের গুরুতা না থাকিলে অস্পৃশ্যত্বাদি হইবে কেন? কিন্তু দশাহ জননাশৌচ ত্রিরাত্র-মরণাশৌচ হইতে গুরু। কালের গুরুত্বই সর্ব্বপ্রধান। অতএব এইরূপ ভাবে বলিলে বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

১। দীর্ঘকালীন অশৌচে স্বল্পকালীন অশৌচ যায়।

২। সমকালীন মরণাশৌচে সমকালীন জননাশৌচ যায়।

৩। সপিণ্ড মরণাশৌচে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী পিত্রাদি মহাগুরু মরণাশৌচ যায়।

৪। পরার্দ্ধপাতী অধবৃদ্ধিমদাশৌচে সপিণ্ড মরণাশৌচ যায়, তথায় সপিণ্ড মরণাশৌচ বাড়ে এবং অধবৃদ্ধিমদাশৌচ ঠিক থাকে।

৫। সপিণ্ড মরণাশৌচের উপান্তদিনের অর্থাৎ অশৌচান্তদিনের পূর্ব্বদিনের মধ্যে অন্য সপিণ্ড মরিলে আর পৃথক অশৌচ হয় না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ৯ দিনের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের ১১ দিনের মধ্য, বৈশ্যের ১৪ দিনের মধ্যে এবং শূদ্রের ২৯ দিনের মধ্যে অন্য সপিণ্ড মরিলে আর পৃথক অশৌচ হয় না, পূর্ব্বাশৌচেই পরাশৌচ যায়।

সপিণ্ডমরণের অশৌচান্তদিনে অর্থাৎ কামানর দিনে অপর সপিণ্ড মরিলে দুদিন মাত্র বাড়িবে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ১২ দিন ক্ষত্রিয়ের ১৪ দিন বৈশ্যের ১৭ দিন এবং শূদ্রের ৩২ দিন অশৌচ হয়। আর যদি অশৌচান্তদিনের ভোরবেলায় অরুণোদয় কালে সূর্য্য না উঠিতে অশৌচান্তর পাত হয়, তাহা হইলে সকল জাতিরই স্ব স্ব অশৌচ অপেক্ষা ৩ দিন বেশী হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ১৩ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১৫ দিন, বৈশ্যের ১৮ দিন এবং শূদ্রের ৩৩ দিন অশৌচ হয়।

জননাশৌচের শাস্ত্রার্থও এইরূপ। যেমন পিত্রাদির মরণাশৌচ—অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ, সেইরূপ স্বপুত্রজননাশৌচও অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ একথা বারান্তরে বলিয়াছি।

৬। সপিণ্ডজননাশৌচে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী স্বপুত্র জননাশৌচ রূপ অঘবৃদ্ধিমদাশৌচ যায়। স্বপুত্রজননাশৌচ- সপিণ্ডজননাশৌচের পরার্দ্ধপাতী হইলে স্বপুত্রজননাশৌচে সপিণ্ডজননাশৌচ যায়। এরূপ স্থলে স্বপুত্রজননাশৌচ দশাহাদি হইয়া থাকে। অঘবৃদ্ধিমদাশৌচেই কেবল পূর্ব্বপরার্দ্ধপাত নিয়ম।

৭। সপিণ্ড জননাশৌচের উপান্তদিনের মধ্যে সপিণ্ডান্তরের জননাশৌচ হইলে পূর্ব্বাশৌচে পরাশৌচ অতীত হয়। অশৌচান্তদিনে অন্য সপিণ্ড জন্মিলে পূর্ব্বাশৌচ দু'দিন বাড়ে, সেই বর্দ্ধিত ২ দিনেই পরাশৌচেরও অন্ত হয়। অশৌচান্তদিনের অরুণোদয়কালে অর্থাৎ ভোরবেলা অন্য সপিণ্ড জন্মিলে পূর্ব্বাশৌচ ৩ দিন বাড়ে। ইতিপূর্ব্বে মরণাশৌচের এই প্রকার ব্যবস্থা বলিয়াছি।

পিতার বা মাতার মরণের স্বজাত্যুক্তাশৌচের উপান্তদিনের মধ্যে মাতার বা পিতার মৃত্যু হইলে পূর্ব্বাশৌচেই পরাশৌচ যায়। পিতার বা মাতার মরণের অশৌচান্তদিনে মাতার বা পিতার মরণ হইলে দু দিন মাত্র বাড়িবে। এবং অশৌচান্তদিনের ভোর বেলায় পূর্ব্বোক্ত অন্যতরের মৃত্যু হইলে ৩ দিন মাত্র বাড়ে।

প্রথম স্বপুত্র জননাশৌচের উপান্তদিনের মধ্যে দ্বিতীয় স্বপুত্র জন্মিলে পূর্ব্বাশৌচেই পরাশৌচ অতীত হয়। একটী পুত্রের জননাশৌচান্তদিনে অপর পুত্র জন্মিলে ২।২দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অশৌচান্তদিনের ভোরবেলায় জন্মিলে ৩ দিন বাড়ে। পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধের কথা সবিশেষ বলি—ব্রাহ্মণের ১০ দিন অশৌচ। সেই ১০ দিনের প্রথম ৫ দিন পূর্ব্বার্দ্ধ ও দ্বিতীয় ৫ দিন পরার্দ্ধ। ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন অশৌচ প্রথম ৬ দিন পূর্ব্বার্দ্ধ এবং সপ্তম দিন হইতে ১২ শ দিন পর্যান্ত পরার্দ্ধ। বৈশ্যের ১৫ দিন অশৌচ প্রথম ৭॥ সাড়ে সাত দিন অর্থাৎ সাতটী অহোরাত্র ও একটী দিবা পূর্ব্বার্দ্ধ, অপর অষ্টম দিবসের রাত্রি হইতে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত পরার্দ্ধ। শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ, প্রথম ১৫ দিন পূর্ব্বার্দ্ধ, শেষ ১৫ দিন পরার্দ্ধ।

মতাগুরু মরণজনিত স্বজাত্যুক্তাশৌচের মধ্যে সপিণ্ড মরিলে আর পৃথক্ অশৌচ হয় না। সেই অশৌচেই উভয় অশৌচের অন্ত হয়, সেইরূপ স্বপুত্র জননাশৌচের মধ্যে সপিণ্ড জন্মিলে পৃথক্ অশৌচ হয় না, স্বপুত্র জননাশৌচে সপিণ্ডজননাশৌচ যায়। স্বপুত্র জননের অশৌচান্ত দিনে অন্য স্বপুত্র জন্মিলে দু দিন অশৌচ বাড়ে। ভোরবেলায় অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অপর স্বপুত্র জন্মিলে ৩ দিন অশৌচ বাড়ে জন্মিয়া বাঁচিয়া থাকিলে এইরূপ অশৌচ হয়। মরিলে অন্যবিধ অশৌচ হয়—সে কথা ক্রমে বলিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

বীরভূম ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

সমাগত ভূদেবমণ্ডলী! যথাযোগ্য নমস্কার ও সম্ভাষণান্তে আমি আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। আমাদের কি আনন্দের দিন। বীরভূমে আজ শ্রীশ্রী৺ব্রাহ্মণ সম্মিলন হইতেছে। নানাস্থান হইতে মহর্ষি-কল্প পণ্ডিতমণ্ডলী ও রাজর্ষি-কল্প ব্রাহ্মণ ভূস্বামি-বৃন্দ, সমাজযন্ত্রের যাঁহারা যন্ত্রী, দেশের যাঁহারা প্রাণস্বরূপ, সেই সর্ব্বজনবরেণ্য, ত্রিলোকবন্দনীয় ভূদেবগণ বীরভূমে সমাগত হইয়াছেন। বীরভূমি আজ পবিত্র হইল! আমরা আজ কৃতার্থ হইলাম।

জীবনে অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, অনেক দৃশ্যদর্শন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য কখনও নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। কি উদার ও মহান্ এই দৃশ্য! দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়ও ভক্তি-রসে আপ্লুত হয়! নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া বক্ষ ভাসাইয়া দেয়!! মস্তক আপনাপনি অবনত হইয়া আইসে! কোন স্মরণাতীতকালে সূর্য্যবংশাবতংস পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি ভগীরথ সুরধুনীর পবিত্র প্রবাহ মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া ছিলেন। সে দিনও যেমন ছিল; ভাগিরথীর পুণ্য সলিল আজিও তেমনি মনোহারী, লোকপাবনকর ও ভুক্তিমুক্তি বিধায়িরূপে ভারতবরেণ্য হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মণ্য মহিমাও তদ্রূপ। কোন স্মরণাতীত দিবসে সৃষ্টির আদিম বাসন্তী প্রভাতে মন্দাকিনীর সুবিমল সুধা ধারা বক্ষে বহিয়া, সত্ত্বগুণময় ভগবদ্বিভূতি যে ব্রহ্মণ্য-বিগ্রহ মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ! আপনাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আজিও সেই দেবতাই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যে নগ্নপদ বল্কল পরিহিত, উপবীতসম্বল জাতি নয়ন পথারূঢ় হইলে সুররাজ ইন্দ্র ঐরাবত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া প্রণত হইতেন; আমি আজ সেই জাতিকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহার অধিক আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কিন্তু এই আনন্দের দিনেও একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছি। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধই ইহার কারণ যে ইংলণ্ডেশ্বর ভারত সম্রাটের ছত্র ছায়াতলে আমরা এতদিন নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতেছি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালনের সুযোগ লাভ করিয়া আসিতেছি, সেই পরাক্রান্ত ন্যায়বান নৃপতিও এই যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। যুদ্ধে বীরজাতি ইংরাজের জয় যদিও সুনিশ্চিত, তথাপি রাজভক্ত ভারতবাসী আমরা সহজেই একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। প্রার্থনা করিতেছি - এক্ষণে দেবতার কৃপায় আমাদের এই উদ্বেগ প্রশমিত হউক। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হইলে কার্য্যে কাহারও প্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণজাতির এই দুর্দ্দিনে এইরূপ অনুষ্ঠান ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই, তাই, ব্রাহ্মণ সম্মিলনের আয়োজন।

গত বৎসর এই সম্মিলন হইয়াছিল মহানগরী কলিকাতায়, পরমপবিত্র মহাপীঠ তীর্থ কালীঘাটে। মফঃস্বলে ইহার অধিবেশন

এই প্রথম। মহর্ষি প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ অধ্যুষিত, জয়দেব চণ্ডীদাসের লীলানিকেতন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের মিলনানন্দ প্রাবিত বীরভূমির, নন্দেশ্বরী পীঠক্ষেত্র, অবশ্য ব্রাহ্মণসম্মিলনের অযোগ্য স্থান নহে। আমি কিন্তু আর এক বিষয়ের কথা বলিতে ছিলাম। কলিকাতা আমাদের দেশের রাজধানী। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে তথায় প্রয়োজনীয় যাহা কিছু অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তদুপরি বিগত সম্মিলনে আপনারা যাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সমস্ত মহাত্মগণ সকলবিষয়েই উপযুক্ত ও কৃতী। বীরভূমে তাহার একান্ত অসম্ভব। আপনাদের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহ বীরভূমে একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হব না। দ্বিতীয় কথা—বীরভূমি অধুনা বড় কাঙ্গাল—বড় দরিদ্রের দেশ। ইহাতেও বা একরূপ চলিতে পারিত; কার্য্যভার যোগ্যব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইলেও হয়ত বা তাহা কোনরূপে নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। আপনাদের অভ্যর্থনা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে, আমার ন্যায় একজন অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণের শ্রীচরণ প্রক্ষালন ব্রত গ্রহণ করিয়া জগতে ব্রাহ্মণ-সেবার প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন; আমি সেই ভূদেবতাগণের অভ্যর্থনা করিবার ভার-প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহজীবনে এরূপ সৌভাগ্যলাভ অবশ্য দুর্লভ। তজ্জন্য আমি আজ নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাঁহারা আমাকে এই কার্য্যের অধিকার দান করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু ত্রুটি বিচ্যুতির আশঙ্কা পদে পদে, তাই ভীত হইতেছি পাছে অপরাধী হই। তবে ভরসা, আপনাদের অনুগ্রহ। আমাদের বিষয় ব্রাহ্মণ চির-ক্ষমাশীল। করুণাসিন্ধু আপনারা, বীরভূমের সমুদয় তথ্য জানিয়া শুনিয়াই আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আজিকার দিনেও অনুগ্রহ করিয়া স্বাগত সম্ভাষণের পর আমাদের প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য বন্দনাদি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

বীরভূমির শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অধুনা ঘরে পরে সকলেই মুখ ফিরাইয়া থাকেন। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। বীরভূমি আজ অন্ধকারময় বলিয়া মনে হইলেও, সে স্থান একটা অতীত গৌরবের স্মৃতি-ধূমে সমাচ্ছন্ন। ধূমান্তরালে ক্ষীণ মৃদু আলো, সে আলোকে অন্বেষণ করিলে এখনও যে কিছু না মিলিতে পারে—এমন নহে। একজন বিভিন্ন স্থানীয় সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন—"বীরভূম জেলায় অনেকগুলি মুনি-তপোবন আছে। বক্রেশ্বরাদি উষ্ণপ্রস্রবণ, ময়ূরাক্ষী অজয়, শাল, হিংলা, দ্বারিকা প্রভৃতি নদ নদী পাহাড়ের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বীরভূমের বেলফুল বড় মনোজ্ঞ। বসোরার গোলাপও তাহাদের সৌন্দর্য্য অবয়ব ও সুরভির নিকট লজ্জা পাইবে। স্বভাবের সুরম্য নিকেতন বীরভূমি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। তাঁহাদের হৃদয়ও সেই বেলফুলগুলির মত সুন্দর ছিল। তাঁহাদের কাব্যে সেই সুন্দর হৃদয়ের অমর প্রতিবিম্ব রহিয়া গিয়াছে।" আমাদের মনে হয় সেই সুন্দর হৃদয় বুঝি আজ মলিন হইয়াছে। আমরা বুঝি সহৃদয়তাটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু একদিন ছিল। আমার আজ

সেই সব কথাই মনে পড়িতেছে, তবে— লিখিবার ক্ষমতা নাই, সভা সমিতিতে যাওয়া বা তদ্বৎস্থলে বক্তৃতাদি বিষয়েও আমি একেবারেই অনভ্যস্ত। সুতরাং বাক্তব্যবিষয় শৃঙ্খলাসম্পন্ন না হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। আশা করি নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

বীরভূমি চিরকাল ব্রাহ্মণ অনুশাসনে শাসিত—সর্ব্বাদৌ সেই কথাই মনে পড়িতেছে। বীরভূমের সেই অতীতকালে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের দিনে বক্রেশ্বর, অট্টহাস প্রভৃতি স্থান হইতে সমুত্থিত হোমধূমে বীরভূমি যখন পবিত্র হইত। কুশীকাশ্রম প্রভৃতি হইতে সমুত্থিত সামঝঙ্কার যখন বীরভূমি মুখরিত করিত, কিন্তু কোন সুদূর অতীতের কাহিনী তাহা! তাই সেদিনের কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিঞ্চিন্ন্যূন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। বীরভূমের বিশ্রুতনামা ব্রাহ্মণ কবি জয়দেব তাঁহার মধুর কোমল কান্ত পদাবলীতে এক দিন সমগ্র ভারতবর্ষ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জকুটীরে বঙ্গ সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের শুভাগমন হইয়াছিল। শ্রীগীতগোবিন্দের সুধা সুমধুর সঙ্গীত কাকলী বৈষ্ণবধর্ম্মে এক নব ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। সে তরঙ্গের মধুর কম্পন আজিও ভারতহৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিতেছে। নান্নুরের নিরঞ্জন পাতের কুটীরে প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস তাঁহার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসও ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পীযূষবর্ষী সঙ্গীতলহরীর মূর্ত্তিমানবিগ্রহ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি এই বীরভূম। হাড়াই পণ্ডিতের পুত্রদান জগতের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। কি অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতা সেই ব্রাহ্মণের! শ্রীচৈতন্যপার্ষদ সুন্দরানন্দের ভাবানুপ্রাণিত ব্রজভূমের প্রেম মধুর মন্ত্রে উজ্জীবিত বীরভূম মঙ্গলডিহির শ্রীপর্ণিগোপাল ঠাকুরও বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পর্ণিগোপালের উপযুক্ত বংশধর "শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিরস-কদম্ব" রচয়িতা ঠাকুর 'নয়নানন্দ' ও সঙ্গীতে কবিতায় বৈষ্ণবধর্ম্মকে বীরভূমের পল্লীনিচয়ে বহুল প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন।

অবতারে শঙ্কর সদৃশ মহাপুরুষ বীরভূমি সিন্দুরের 'বিরূপাক্ষগোস্বামী' ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। "মৃণাল দীঘি" প্রভৃতি পণ্ডিত খনি প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীরভূমেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৃণালদীঘির "তারাচরণ তর্করত্ন" 'রামচরণ ন্যায়চূড়ামণি' প্রভৃতি পণ্ডিতগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি এক সময় সমগ্র বঙ্গে পরিব্যাপ্ত ছিল। এক দিন সবই ছিল—আজ কিছুই নাই। আজ আমাদের মত অধঃপতিত আর কাহারা? এত দুর্দ্দশা আর কাহাদের? ধর্ম্ম ভুলিয়া ত্যাগ সংযম সদাচার হারাইয়া আমরা এখন পথের ভিখারী হইয়াছি, কিন্তু তথাপি হতাশ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। যখন আপনারা আসিয়াছেন—নিশ্চিতই একটা উপায় হইবে। আমার ভরসা জাগিয়াছে; ৺নন্দেশ্বরীপীঠক্ষেত্র আজ নৈমিষারণ্যের স্থান অধিকার করিবে। জনহিত পরায়ণ মহর্ষিকল্প হে ভূদেবমণ্ডলী! সমাজরক্ষাকল্পে আপনারা বর্ত্তমান কালোপযোগী বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। সেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দেওয়া ও ধৃষ্টতা মনে করি। তবে আমার অন্তরের কথা দুই চারিটী আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি মাত্র। অবহিত হইলে অনুগৃহীত হইব। পিতৃ পিতামহগণের আচরিত সনাতন

হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান, আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়; ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইলেও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ পুনঃ সংস্থাপন ভিন্ন দেশের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত; চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। 'আপাত অসম্ভব' বলিতেছি এই জন্য যে সমাজ বন্ধন বড় শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রম চতুষ্টয়ের একটীও আমাদের বর্ত্তমান নাই। সুতরাং এ কার্য্যে আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। সংযম ভিন্ন চরিত্রবান হওয়া যায় না, এবং ব্যক্তিগত সচ্চরিত্রতার অভাবে জাতিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তবেই দেখা যাইতেছে আশ্রম চতুষ্টয়ের যেটী প্রথম, সর্ব্বাগ্রে সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাই আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী "শ্রীগৌরাঙ্গমঠ" নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। প্রাচীন যুগের আদর্শ অনুযায়ী গুরুগৃহের মত ছাত্র প্রতিপালন করিয়া দ্বাদশবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মাচরণ এবং বর্ত্তমান কালোপযোগী অপরাপর বিষয় নিচয়ের শিক্ষাদানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপে আদর্শ গড়িতে পারিলে কালে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন একরূপ সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। কিরূপে এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে—ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আলোচনা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। "শ্রীগৌরাঙ্গ মঠের" কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে আমরা আপনাদের মূল্যবান অভিমত আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু এই একটী কার্য্যের অনুষ্ঠানেই আমাদের সকল কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইবে না। ভীষণসমাজ ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে আরও অনেক বিষয়েই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বরপণ, কন্যাপণ গ্রহণ প্রভৃতি যে সমস্ত পাপপ্রথা সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সে গুলির সমূলে বিনাশ সাধন করিতে হইবে। আর একটী অবশ্যকরণীয় কার্য্য—পল্লী গ্রামগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে, সমাজ এখনও পল্লীগ্রামেই আছে। পল্লীগুলি লইয়াই দেশ। এই পল্লী শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পল্লীগুলি না টিকিলে কুলধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না, সুতরাং জাতি বাঁচিবে না। এ সমস্ত কার্য্যেই অর্থ আবশ্যক। ভারতের জ্ঞানবল ও অর্থবলের সামঞ্জস্য সংসাধন ভিন্ন আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সকলের মূলে আমাদের ধর্ম্ম। ধর্ম্মের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতে কোনও কিছুই তিষ্ঠিতে পারিবে না। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, আমাদের একমাত্র আশ্রয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কামনা করিয়া আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

কতকগুলি "হইবে" ও "হইবে না" র সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আর আপনাদিকে বিরক্ত করিতে চাহি না। কিসে আমাদের দুর্দ্দশা দূর হয়, আমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইতে পারি, আপনারাই তাহার উপায় বিধান করুন। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্গের এতগুলি মনিষী যখন একত্রিত হইয়াছেন, তখন আমাদের আশা অপূর্ণ থাকিবে না ইহা সুনিশ্চিত। অলমিতি।

নিবেদক—

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

বীরভূম।

বীরভূম ও ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন।

এবারে "ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের" তৃতীয় অধিবেশন বীরভূমে সাড়ম্বরে সমাপিত হইয়াছে। মহাসম্মিলনের প্রস্তাবসমূহের আলোচনা বা তাহার পূর্ব্বাপর বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে বীরভূম মহাসম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া সেখানে যে কয়েকটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি—তাহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

১। সাঁইথিয়া ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রী৺নন্দেশ্বরী মাতার পীঠ সন্নিধানে সম্মিলনের স্থান হইয়াছিল। বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে সভামণ্ডপ বড় সুন্দর মানাইয়াছিল। সম্মুখে ময়ূরাক্ষী নদী। রৌদ্রের প্রখরতাপে হউক বা বীরভূমের স্বভাবসুলভ মৃত্তিকার শোষণের গুণেই হউক ময়ূরাক্ষীর প্রবাহ ফল্গুনদীর মতই প্রায় অদৃশ্য। স্থানে স্থানে অল্প অল্প জল আছে বটে, কিন্তু তাহা আবার ঘোলা। যাহা হউক—স্থান মাহাত্ম্যে মহাসম্মিলন জমিয়াছিল ভাল। বীরভূমবাসীরা এইস্থানে মহাসম্মিলনের স্থান করিয়া বিশেষ বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছিলেন।

২। সম্মিলনের মণ্ডপও একটী সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। আধুনিক সভা সমিতির ন্যায় ইংরাজীকায়দায়—ইহা নির্ম্মিত হয় নাই। মণ্ডপ দেখিয়াই পুরাতনযুগের একটী উজ্জ্বল ছবি আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। সেই পুরাতনকালের চন্দ্রাতপ, সেই পুরাণ চিত্র বিচিত্র সামিয়ানা, সেই পুরাতন সাজসজ্জা আদপ কায়দা সবই বজায় ছিল। বীরভূমের জমীদারদিগের গৃহ হইতেই সম্ভবতঃ এসব আনয়ন করা হইয়াছিল, এখন আর এসব কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীন শিল্পের এই বিরাট নিদর্শন ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের সঙ্গে বেশ মানাইয়া ছিল।

৩। বীরভূমের অভ্যর্থনা সমিতিতেও একটী বিশেষত্ব ছিল। বোধ হয় অভ্যর্থনা সমিতির কাহারও বাড়ী সাঁইথিয়াতে ছিল না। সেই হেতমপুর, কুণ্ডলা বা আরও বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে সমস্ত জিনিষপত্র আনাইয়া আয়োজন উদ্যোগ—একটা মহাপ্রাণতার লক্ষণ। শুনিয়াছি বীরভূমের অনেকগ্রামের ব্রাহ্মণবর্গই এই অভ্যর্থনাসমিতিকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের উন্নতি যে সেখানকার সকলের বিশেষ অভীষ্ট, তাহা এই ব্যাপারেই বুঝা যায়। এই সমস্ত আয়োজন উদ্যোগে যদি কোথাও একটু ত্রুটি লক্ষিত হইয়াও থাকে, তাহা নূতন স্থানে সম্মিলনের স্থান নির্ব্বাচন জন্যই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা বীরভূমের অভ্যর্থনা সমিতিকে তাঁহাদের এই বিরাট অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিই।

৪। বীরভূমের ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া বুঝা গেল যে, বীরভূমে এখনও একটী ব্রহ্মণ্যের ক্ষেত্র আছে। সমাজের চেতনাশক্তির অভাবে সেইক্ষেত্র অধুনা অনুর্ব্বর হইয়া পড়িলেও তাহার অভ্যন্তর যে ভাল, তাহা বেশ বুঝা যায়। সেখানকার রাজা, মহারাজা, জমীদার, বিষয়ী, পণ্ডিত ও সাধারণ সকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-মধ্যেই একটী ব্রাহ্মণ্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ বেশ লক্ষ্যের বস্তু। হেতমপুরের মহারাজা বাহা-

দুর "গৌরাঙ্গ মঠ" প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণ-বালকগণের সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেখানে বালকগণকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হইয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে। "গৌরাঙ্গ মঠের" ব্রহ্মচারী কতিপয়ছাত্র সম্মিলনের প্রারম্ভে সুস্বরে মঙ্গলাচরণ পাঠ করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল।

৫। কেন্দুবিল্বের মহাপুরুষ জয়দেবের নাম অনেকে অবগত আছেন। যাঁহার গীত-গোবিন্দের মোহন সঙ্গীতে একদিন ভগবান-কেও বীরভূমে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল। সেই গীতগোবিন্দের প্রসূতি জয়দেবের কেন্দু-বিল্বে একটী মঠ আছে। সেই মঠের একজন সাত্বিক মহাত্মা মোহান্ত আছেন। ইনি মোহান্ধ নহেন—বাস্তবিকই মোহান্ত। ইনি সম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া দ্বিতীয়দিবস আবেগময়ী বক্তৃতাচ্ছটায় সকলকে কাঁদাইয়াছিলেন। বাঙ্গলা ইহার মাতৃভাষা নহে। কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালায় এমনি মাধুরী ছিল যে সেই ভাষা অদ্যাপি আমার কর্ণে বাজিতেছে। ব্রজবুলির মত সেই ভাষা কেন্দুবিল্বের মোহান্তের উপযুক্তই হইয়াছিল। বাস্তবিক এইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ মোহান্তের কথা অল্পই শুনা যায়। সাধারণতঃ মোহান্তেরা সভাসমিতিতে বড় মেশেন না। কিন্তু ইনি বিষয়ী হইয়াও নির্ব্বিষয়ী, ধনী হইয়াও নির্ধন, উচ্চ হইয়াও তৃণাদপি সুনীচের মতই সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কেন্দুবিল্বের মাটীর গুণেই বোধ হয় এইরূপ মহাত্মার আবাস স্থান হইয়াছে।

৬। মহাসম্মিলনের প্রথমদিবসের অধিবেশনের প্রাক্কালে অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত কালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একখানি পত্রপড়িয়া সভ্যবৃন্দকে শুনাইলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ, —"বরিশালের কোন গণ্ড গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহার সহস্রাধিক টাকার নিজস্ব সম্পত্তি আছে, সেই সমস্ত টাকার সম্পত্তি তিনি ব্রাহ্মণসম্মিলনের কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত করিতে চান। উদ্দেশ্য—যে সমস্ত ব্রাহ্মণ সামাজিক বিপ্লবে উৎপীড়িত হইয়া অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, হয় ত বা সংসারের কষ্টে অসৎপথে গমনে উদ্যত, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের কথঞ্চিৎ রক্ষা"। এই পত্রের যখন কালিকা বাবু পাঠ শেষ করিলেন, তখন সভায় কেহই চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারে নাই। একজন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত, এইরূপ দান হিন্দুর ইতিহাসে বিরল নহে, কিন্তু অধুনাতনকালে অত্যন্ত বিরল সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণ এখনও আছেন বলিয়া হিন্দু সমাজ বিলুপ্ত হয় নাই।

৭। সায়ং সন্ধ্যা,- মহাসম্মিলনের দ্বিতীয় দিবস অধিবেশন শেষ করিতে অনেক রাত্রি হয়। এ জন্য সন্ধ্যার সময় সভ্যবৃন্দকে সন্ধ্যানুষ্ঠান জন্য এক ঘণ্টা অবসর দেওয়া হইয়াছিল। ঘণ্টা খানিকের জন্য সভাভঙ্গ হইলে স-সভাপতি বহুশত ব্রাহ্মণ, যখন ময়ূরাক্ষীতটে সন্ধ্যোপাসনায় বসিলেন; তখন একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। শত শত ব্রাহ্মণকে একস্থানে একভাবে উপাসনা করিতে কখনও দেখি নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষয়ী, জমিদার প্রভৃতি সকলে এক ভাবের ভাবুক হইয়া সংসারের ক্ষুদ্র মানাপমান ছাড়িয়া যখন নদীতটে সন্ধ্যোপাসনায় নিরত হইলেন, তখন পুরাতন যুগের একটী দৃশ্যপট মনে সমুজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। বক্তৃতাদি দ্বারা যে কার্য্য হয় না, একমাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই কার্য্য সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ মহা-

সম্মিলন এই ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন।

৮। ব্রাহ্মণের পদধূলি—মহাসম্মিলনে আর একটী বিষয় বড় চমৎকার দেখিলাম। তাহা—সভা ভঙ্গের পর ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহের চেষ্টা। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অধ্যুষিত সেই বিরাটসভা মণ্ডপস্থ অধিবেশন যখন ভঙ্গ হইয়া গেল তখন ব্রাহ্মণ শূদ্র অনেকেই সভাঙ্গনে বিস্তৃত জাজিম ঝাড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ সংগ্রহ করিলেন। যে জাতির মনে এখন পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণের প্রভাব জাগরূক আছে—সেই জাতি কখনও ধর্ম্মহীন হইতে পারে না। মানুষ একশ্রেণীর মানুষকে কেন এরূপ গৌরব দিল, কেন ব্রাহ্মণ এত উচ্চ হইলেন, তাহা কি চিন্তার বিষয় নহে! এখন ব্রাহ্মণ কাল দোষে হীন হইলেও এখন ব্রাহ্মণ অধিকাংশ স্থলে জাতিমাত্র সার হইলেও সে যে গুণে বড় হইয়াছিল—তাহা কি আবার লাভ করিতে পারে না? পদধূলি সংগ্রহ ব্যাপারে ব্রাহ্মণকে বুঝান হইল যে—তোমার অন্তর্নিহিত অস্ফুটশক্তি এখনও বর্ত্তমান আছে সেই শক্তিরই আদর করা হইতেছে। সেই ব্রাহ্মণ্যেরই পূজা করা হইতেছে। তুমি আবার সেইরূপ বড় হও, আবার সেইরূপ বরেণ্য হও। যে, যে বৃত্তিতে থাকে; সেই বৃত্তির আদর না করিলে সমাজের প্রতিষ্ঠা হয় না। ব্রাহ্মণের যাহা কর্ম্ম, তাহার আদর সমাজ চিরকালই করিয়া আসিয়াছেন, এখন সেইরূপ ব্রাহ্মণের আদর নাই, তাই ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তিতে সন্তুষ্ট নহে। তাই বৃত্ত্যন্তর গ্রহণে ব্রাহ্মণ ক্রমে বাধ্য হইতেছেন। এখন যদি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের আদর করা যায়, তবে ব্রাহ্মণ "অদ্যভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" হইয়াও স্ববৃত্তিতে তুষ্ট থাকিবেন। জাতীয় গৌরব হৃদয়ে প্রবেশ না করিলে, জাতীয়তার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি না থাকিলে—একটা জাতিগঠিত হইতে পারে না। এখনও সামাজিকগণ ব্রাহ্মণের আদর করিতে সম্পূর্ণ ভুলে নাই, এখনও ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যজ্যোতিঃ খুঁজিয়া মিলে। বীরভূমও ব্রাহ্মণের আদর অদ্যাপি ভুলে নাই। আশা হয় বীরভূমের এই ব্যবহারে অনেক ব্রাহ্মণের জাতীয় গৌরব সন্ধুক্ষিত হইবে।

৯। বীরভূমের সঙ্কীর্ত্তন। বীরভূমের সঙ্কীর্ত্তন বড় মনোহর। গীত গোবিন্দের দেশে সঙ্কীর্ত্তন যে এইরূপ মনোহর হইবে। তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে—সেই পুরাতন কাল হইতে সেই সঙ্কীর্ত্তনের ধারাটী ঠিক বজায় আছে। সেই পুরাতন খোল করতাল সিঙ্গা লইয়া একশ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায় যখন সম্মিলন মণ্ডপে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল; তখন বহুলোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে যে একটী প্রগাঢ় ভাবাবেশ আছে—একটী যে মোহকর উন্মাদক আকর্ষণ আছে তাহা পূর্ব্বে বড় অনুভবে আসে নাই। তালেতালে পা ফেলিয়া উন্মাদ নৃত্যের সঙ্গে যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল—তখন মনে হইল যে 'ভাবাবেশে সজ্ঞাশূন্য' হওয়ার কথা অলীক বা অবিশ্বাস্য নহে।

বীরভূমের ব্রাহ্মণসম্মিলনে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। অনেক নিস্ব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহুদূর দেশ হইতে কার্য্য ক্ষতি করিয়াও আসিয়াছিলেন। কেহ কিছু লাভের আশায় আসেন নাই। প্রাণের টান এমনি বস্তু। ব্রাহ্মণের মধ্যে এইরূপ মিলন বড় আবশ্যক, পূর্ব্বে অবশ্য বড় বড় কার্য্য উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া এইরূপ

মিলনের সুযোগ পাইতেন—কিন্তু তাহা প্রায়ই বড় বড় অধ্যাপকের ভাগ্যেই জুটিত, এইরূপ মিলনটি বড়র মধ্যেই হইত, উদ্দেশ্যও তাঁহাদের অনুরূপ ছিল। কিন্তু এখন আর সেরূপ প্রায় জুটে না। এখন আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণব্রাহ্মণের মিলন বড় হয় না ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন উপলক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণের এইরূপ মিলনে সমাজের বল বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। সমাবস্থ বা হীনাবস্থ বহু লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটিলে নিজের অবস্থায় শ্রদ্ধা হয়। বৃত্তির প্রতি অনুরাগ জন্মে। বিশেষতঃ দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গেও মিলন ঘটে। তাঁহারাও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এইরূপ পরিচয় নাই বলিয়াই তাঁহারা দেশের বড় বড় কার্য্য উপেক্ষিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিশিষ্ট চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; তাহাতে সমাজের কল্যাণ হইবে। ব্রাহ্মণসম্মিলন দ্বারা এই কল্যাণের সূত্রপাত হইয়াছে।

১১। সম্মিলনে আর একটী বড় ভালকার্য্য লক্ষ্য করিয়াছি। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের জমীদারবর্গ নিজের অন্তঃপুরে এখনও বেশ হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় দিবস সম্মিলনের প্রারম্ভে যখন উক্ত জমীদার বর্গের ভাগিনেয়গণ তান লয় সহকারে শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গর' আবৃত্তি করিতে লাগিলেন তখন সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। জমীদার পরিবারের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে যে একটু একটু করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়—তাহা বড়ই আবশ্যক। ইংরাজি শিক্ষায় হৃদয়ে যে বিষ সঞ্চার হয় তাহার বিরেচকস্বরূপ কিছু কিছু সংস্কৃত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। শৈশব হইতে এইরূপ শিক্ষা হইলে পরে বালকগণ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইতে পারে না। সমাজের সঙ্গে তাহার বেশ সৌহার্দ্দাও থাকে অধুনাতন শিক্ষিত শ্রেণী এ সব বিষয়ে বড় লক্ষ্য করেন না, তাই ইদানীন্তন বালক ও যুবকগণ এক একটী বাবুর দলে পরিণত হইতেছে, আহারে বিহারে শৃঙ্খলা নাই, আচারে বিচারে লক্ষ্য নাই—শাস্ত্রের প্রতি ও কাহার শ্রদ্ধা নাই। এইরূপ দলের যতই সৃষ্টি হইবে ততই দেশের অবনতি। আশাকরি অনেকে এই বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন। ইতি—

শ্রীপঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ।

একুশসাল।

যাচ্ছ অতীত, চলে যাও যদি—মুক্ত বাসনা ডোর,
ছিঁড়েছ তবে, রাখিব কেমনে—দিয়ে এ নয়ন-লোর।
গতানুগতিক ধরায় কেহ—ধরিতে পারে না কারে।
যাচ্ছ যদি, চলে যাও আর—ডাকিব না ক্ষীণ স্বরে।
পূর্ণ বাসনা দীন প্রার্থনা—বাজে না কাহারো কাণে ;—
তাইত তোমায় ডাকিবনা ওগো-বেদন ব্যথিত প্রাণে।
কেউত কখন কাহাকে অপেখি'—রহেনাক'চিরকাল—
(যাচি) অশ্রুসিক্ত কাতর কণ্ঠে—বিদায় একুশ সাল ॥
সুখ ও দুঃখ পূর্ণিত তুমি—বাঞ্ছিত স্মৃতি ঘেরা।
তৃষিত বক্ষঃ শিতলিতে কত ঢেলেছ মাধুরী ধারা।
সান্ত্বনা তব যন্ত্রণা মাঝে মন্ত্রনা মোহ দানে—
অমৃত তিক্ত গরল ঢালিয়া পাগল করেছে প্রাণে —
আশার পূর্ণ রক্তিম ছটা ভাবি সময়ের চেয়ে—
তুমিই অতীত রেখেছ আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ছেয়ে।
ধন্য অতীত, তোমার মোহে আবরিত চিরকাল—
যাচ্ছ যাও চিরতরে আজ বিদায় একুশ সাল ॥
করিলেন বিধি ললাটে তব কলঙ্ক কষাঘাত।
সঙ্গে আনিয়া যুদ্ধ দুর্ম্মদ দানব ঝঞ্ঝাবাত।
অগ্ন্যুৎপাতে ইটালিদেশ করে দিলে ছারখার।
ভারত গগন বিপ্লব মেঘে করিলে অন্ধকার।
যুদ্ধের ছলে য়ুরোপ ভিতরে বহালে রক্ত নদী।
রোদন উৎসব প্রতি গৃহে তবু কাঁদেনা তোমার হৃদি।
বিশ্ব ইতিহাস রক্তে ভাসালে আপনিও হলে লাল ;—
আসিওনা আর রৌদ্রবেশে বিদায় একুশ সাল ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

চণ্ডী রহস্য।

অবতরণিকা।

(১)

ব্রহ্মময়ী মহামায়ার যে লোকোত্তর চরিত্র পর্য্যালোচনার নিমিত্ত আজ এ ক্ষুদ্র হৃদয় ব্যাকুল, মহামুনি মেধস জগদম্বার সেই চরিত্র সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন—সেই বর্ণনাময় গ্রন্থের নাম চণ্ডী। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ; চতুর্দ্দশ মনু ও মন্বন্তর বর্ণনাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

সাবর্ণিনামক অষ্টম মনুর অধিকার বর্ণনার ভূমিকায়ই প্রসঙ্গক্রমে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম ঘটনা এইরূপ—

অঙ্গদেশের চৈত্রবংশ সম্ভূত * সুরথরাজা, এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। কদাচ রাজকর্ত্তব্য রক্ষণে কোনরূপ ত্রুট করিতেন না।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কোলাবিধ্বংসি † রাজনাগণ তাঁহার শত্রু হইল, তাঁহাদের সহিত সুরথের যুদ্ধ বাধিল। শত্রুপক্ষ বলবিক্রমে সুরথ অপেক্ষা হীন হইলেও কূটযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমস্ত রাজ্য কাড়িয়া লইল। পরিশেষে সুরথ রাজা মাত্র নিজ দেশটাই শাসন করিতে লাগিলেন। বিপদ বিপদের অনুগামী, তখনও বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট অমাত্যগণ তাঁহার ধনাগার ও সৈন্যাদি হস্তগত করিল। রাজা হীনবল ও নিরুপায় হইয়া অশ্বারোহণে বনে চলিয়া গেলেন। দুঃখে ও ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রবল বিজিগীষা প্রতিক্ষণে সুরথের মর্ম্মস্থল ভেদ করিতেছিল। তিনি ক্রমে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে মেধস মুনির অপূর্ব্ব আশ্রম দেখিতে পাইলেন।

এই ধর্ম্মাশ্রমের হিংস্র শ্বাপদকুলও শান্ত স্বভাব ও হিংসাদ্বেষ পরিশূন্য। মুনি রাজাকে পরম সমাদরে আশ্রমে রাখিলেন। রাজা কিছু দিন ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তে শান্তি আসিল না।

তিনি ইতস্তত ঘুরিতেছেন আর একাকী

* চন্দ্রের তনয় বুধ—ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ও কুবেরের বীর্য্যে উৎপন্না চিত্রা নামক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপুত্র চৈত্র—সেই চৈত্ররাজের পুত্রই দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত মণ্ডলেশ্বর সুরথরাজা। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে—চৈত্র, স্বারোচিষ মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

† কোলাশব্দের অর্থ, সুরথের রাজধানী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

কোলা সুরথস্যৈব রাজধান্যন্তরং (নাগোজীভট্ট) কোলা-নাম-তদীয় রাজধানী, তৎপ্রমথনশীলাঃ কোলাবিধ্বংসিনঃ (তত্ত্বপ্রকাশ) পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন, কোল অর্থে শূকর, অবি অর্থে মেষ, শূকর ও মেষঘাতী কাশ্মীরের সীমান্তদেশাধিপতি ম্লেচ্ছগণই কোলাবিধ্বংসি শব্দের অর্থ। দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর সঙ্গত, কেননা রাজধানী বিধ্বস্ত করার পূর্ব্বে তাহাদের নাম কোলাবিধ্বংসী হওয়া ঠিক নহে।

মনে মনে ভাবিতেছেন হায়! রাজরাজেশ্বর আমি, আজ অরণ্যে! আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের শাসিত রাজ্য আজ শত্রুহস্তে। আমার দুষ্ট স্বভাব কৃপণ ভৃত্যগণ কি এ রাজ্য ধর্ম্মানুশাসনে পালন করিতেছে? জানি না, আমার সেই প্রিয়তম মত্তহস্তী শত্রুহস্তে পতিত হইয়া, কিরূপ আহার্য্য পাইতেছে; নিয়ত পারিতোষিকাদি লাভে পরিতুষ্ট যে সকল ভৃত্য সর্ব্বদা আমার অনুগত থাকিত, তাহারা নিয়তই এক্ষণে অন্য নরপতির সেবায় নিরত আছে। বহুক্লেশে সঞ্চিত আমার সেই সুসমৃদ্ধ কোষাগার, সতত অসদ্ব্যয়িগণের হস্তে পড়িয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। এইরূপ চিন্তায় রাজার চিত্ত তখন অনুতাপানলে বিদগ্ধ এবং প্রবল প্রতিহিংসাধূমে সমাচ্ছন্ন হইল। এই তীব্র রজোগুণময় চিত্ত—কি সহসা শান্তির অধিকারী হইতে পারে? রাজা এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতেছেন, এমনি সময়ে দেখিতে পাইলেন—একটী দীনভাবাপন্ন লোক, ধীরে ধীরে আশ্রম অভিমুখে আসিতেছে, তাহার মুখ অপ্রসন্ন, হৃদয় চিন্তাকুল, অশ্রুজলে নয়নদ্বয় সুসিক্ত। রাজা তাহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহাশয়! আপনি কে? কি জন্যই বা এখানে আসিয়াছেন? আপনাকে শোকাকুলের ন্যায় দুর্ম্মনা দেখিতেছি, এই মনস্তাপের কারণ কি"?

আগন্তুক, রাজার প্রণয়বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিল, হয়ত ইনিও আমার সমাবস্থ। ঘোর বিপন্নিকালেও সমাবস্থ ব্যেক্তি পাইলে হৃদয় খুলিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা হয়, আগন্তুকেরও আজ তাহাই হইল, তিনি নিজ দুঃখকাহিনী বলিয়া রাজাকেও তাহার অংশভাগী করিতে লাগিলেন।

"আমি জাতিতে বৈশ্য, আমার নাম সমাধি, ধনিকুলেই আমার জন্ম ছিল, কিন্তু আজ আমি পথের ভিখারী। অসৎস্বভাব স্ত্রীপুত্রগণ, আমার দুঃখোপার্জ্জিত সমস্ত ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। এই বিশ্বস্ত আত্মীয়বর্গ দ্বারা নিরাকৃত হইয়া মহাদুঃখেই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু বহুদিন হইল, সেই স্ত্রীপুত্রাদির কুশল সংবাদ জানিতেছি না, তাহারা কুশলে আছে কি কোনও অমঙ্গল ঘটিয়াছে, এক্ষণে এই ভাবনায়ই আমার হৃদয় ব্যাকুল।"

রাজা বলিলেন, "যে নিষ্ঠুর স্ত্রীপুত্র—পতিভক্তি ও পিতৃভক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া ধন লোভে আপনাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদের জন্যই আবার আপনি ব্যাকুল?"

বৈশ্য বলিলেন, "মহাশয়! ঠিক কথা, আপনি আমার মনের কথা কহিয়াছেন। তাহারা এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিলেও আমার মন যে, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হইতেছে না, এ যে কি অদ্ভুত প্রহেলিকা! জানিয়াও জানিতেছি না—বুঝিয়া বুঝিতেছি না" এইরূপে অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর দুইজনেই, মহামুনি মেধসের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন—"ভগবন্ আমাদের একটী সন্দেহ হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সমাধান করিয়া দিন।"

রাজা বলিলেন, আমার রাজ্য শত্রুগণ কাড়িয়া লইয়াছে এবং এই বৈশ্যবরও ধনলোলুপ স্ত্রীপুত্রাদি কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছেন তথাপি আমাদের সেই রাজ্যও স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমত্ব রহিয়াছে। আমরা জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানের ন্যায় এই সকলের

মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মুনিবর একি অদ্ভুত রহস্য?"

মেধস মুনি রাজার জ্ঞানাভিমান দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝাইতে লাগিলেন, "সুরথ তুমি যে জ্ঞানের অভিমান করিতেছ; ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই জ্ঞান পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি জীবেরই আছে, সকল জন্তুরই স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গোচরে জ্ঞান থাকে, এই সকল বিষয় আবার পৃথক্ পৃথক্ দেখ! কোনও প্রাণী দিবান্ধ (পেচকাদি) অপর প্রাণিগণ রাত্র্যন্ধ (মনুষ্যাদি) কোনও কোনও প্রাণী অহোরাত্রি উভয়কালেই সমদৃষ্টি সম্পন্ন (মার্জ্জারাদি) সুতরাং তাহাদেরও সামান্য জ্ঞান আছে।

মানুষ যে পুত্রাদির প্রতি অভিলাষযুক্ত হয়, তাহা কেবল লোভমূলক, অর্থাৎ পুত্রাদি হইতে প্রত্যুপকার পাইবে বলিয়া। কিন্তু ঐ দেখ! পক্ষিগণ নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও দুঃখে কষ্টে দুই একটী তণ্ডুলকণা সংগ্রহ পূর্ব্বক শাবকের মুখেই অর্পণ করিতেছে। তাহাদের কোনও প্রত্যুপকারের অভিলাষ নাই।

মনুষ্য ও পশুপক্ষিগণের জ্ঞানে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উভয়েরই জ্ঞান একপ্রকার তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ প্রত্যুপকারের অভিলাষ থাকুক আর নাই থাকুক, মহামায়ার প্রভাবে সংসার স্থিতিকারী প্রাণিগণ, মমতারূপ আবর্ত্তপূর্ণ মোহগর্ত্তে নিপাতিত হইয়া অনুক্ষণ ঘুরিতেছে, মহারাজ! এতে আর বিস্মিত হইবেন না।

এই মহামায়ার মায়ায়ই জগৎ সংমোহিত, এই অঘটন ঘটন পটীয়সী ভগবতী মহামায়া, জ্ঞানিগণেরও চিত্ত, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিপাতিত করেন। ইনিই জগৎ সৃজন পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। মানুষ প্রাণভরে যাচ্ঞা করিলে ইনি, জ্ঞান প্রদান করেন এবং পরিতুষ্টা হইলে ঐশ্বর্য্যও দিয়া থাকেন"।

মুনির শেষ কথাটী শুনিয়া প্রতিহিংসা ক্রান্ত-চিত্ত সুরথরাজার, ঐশ্বর্য্য কামনা উদ্দীপ্ত হইল। আর ভগবতীর কৃপায় জ্ঞানপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া নির্ব্বেদপরায়ণ বৈশ্যবরের জ্ঞান-পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল।

আজ মেধস মুনির আশ্রমে সমান অবস্থা সম্পন্ন দুইটীব্যক্তি উপস্থিত, অবস্থাটা সমান হইলেও উভয়ের লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত বিভিন্ন, সুরথরাজা শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত, কোনও উপায়ে শত্রুবিজয় করিতে পারিলেই আবার সুরথ রাজ্যেশ্বর; আবার পত্নী পুত্রাদি পরিজন পরিবেষ্টিত মহারাজ সুরথ, পরম আহ্লাদে ভাসিবেন; সুরথের এই আশা অতীত হয় নাই, সুতরাং তখনও সুরথরাজার চিত্ত রাজ্যলোভে অধীর।

আর সমাধি বৈশ্যের আর এক ভাব। সমাধি বৈশ্য, যাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ব্বাহার্থ প্রাণপণে ধনরত্নাদি উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই স্ত্রীপুত্রাদিই তাঁহার প্রতি বিমুখ; সুতরাং বৈশ্যের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়! আজ বৈশ্যের পক্ষে সংসার প্রকৃতই দুঃখময় ভীষণ অরণ্যানী সেই অরণ্য মধ্যস্থ পত্নীপুত্ররূপ হিংস্র শ্বাপদকুল, আজ বৈশ্যের জীবন সংহারে উদ্যত। সেই চির লালিত বন্ধুগণ যাহার বিরূপ, সে যে বিষয় দোষ দর্শনে বৈরাগ্যবান্ হইবে, এ কথা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বৈশ্য আর সাংসারিক সুখ চাহে না। বৈশ্য চাহে শান্তি, বৈশ্য জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞানতায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে আর ইচ্ছা করে না।

'দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয় বিতৃষ্ণ' বৈশ্যবর আত্ম জ্ঞানের জন্য মেধস মুনির শরণাপন্ন। সুতরাং সুরথরাজা ঘোর প্রবৃত্তিমার্গী, আর বৈশ্য-নিবৃত্তি পথের পথিক।

মহামুনি মেধস এইরূপে অত্যন্ত বিরুদ্ধ-ভাবদ্বয়ের ভাবুক সুরথ ও বৈশ্যবরকে দেবী-মাহাত্ম্য উপদেশ করিতেছেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিলেন, সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্ন হইলেন, এবং ইহার কর্ম্মই বা কি?"

মেধসমুনি, রাজার ঘোর অজ্ঞানতাপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া, মনে মনে হাসিলেন, যাহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে এবং যাহাতে প্রলীন হইবে সেই মহামায়ার আবার উৎপত্তি? প্রকাশ্যে বলিলেন; সেই জগন্ময়ী দেবী নিত্যা, তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, তাহা-দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রয়োজন বশে তাঁহার যে বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি, সেই অভিব্যক্তিরূপ উৎপত্তির কথা বলিতেছি।"

"দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি যখন যখন আবির্ভূতা হইয়াছেন, তখন তখন অজ্ঞান মনুষ্যগণ তাঁহাকে উৎপন্না বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, এইরূপ বহু প্রকার উৎপত্তির পবিত্র কথা শ্রবণ কর।"

দেবীমহাত্ম্যে তিনটী চরিত্রের কথা উল্লিখিত, প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তর চরিত। প্রথম চরিতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যোগ-নিদ্রার স্তুতি ও মধুকৈটভ বধ, মধ্যম চরিতে মহিষাসুর বধ ও উত্তর চরিত্রে শুম্ভনিশুম্ভ নিধন বর্ণিত হইয়াছে। মহামুনি মেধস, অগ্রে প্রথম চরিত বর্ণনা করিতেছেন।

প্রথম চরিত।

মধুকৈটভ বধ।

মহাপ্রলয়ে জগৎ একার্ণবীকৃত, ভগবান্ বিষ্ণু সেই একার্ণবে অনন্ত শয্যায় শায়িত হইয়া যোগনিদ্রা উপভোগ করিতেছেন। এমনিকালে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন মধু-কৈটভ নামক ঘোর অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, প্রজাপতি বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থান করিয়া একাগ্র হৃদয়ে যোগ-নিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন্—

"হে দেবি! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বষট্কাররূপিণী, তুমি সুধা, এবং অক্ষর সমুদায়ে তুমি ত্রিমাত্রারূপে (ওঙ্কাররূপে), অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বভাবতঃ অনুচ্চার্য্যা অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপিণী, হে দেবী তুমি সাবিত্রী এবং তুমিই জননী।" ব্রহ্মা, পরম যাজ্ঞিক, তিনি যে সর্ব্বব্যাপী যোগনিদ্রার স্তুতি করিতে গিয়া, সর্ব্বাগ্রেই তাঁহাকে নিত্য পরিচিত যজ্ঞীয় সাধন স্বাহা, স্বধা, বষট্কার, ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রারূপে স্তব করিবেন, তাহা অতিশয় স্বাভাবিক। ব্রহ্মা আদি কবি হইলেও এই ঘোর বিপত্তি সময়ে, বিষম আর্ত্তরূপে মহামায়ার স্তবে কবিত্বের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতে পারেন কি?

ব্রহ্মা, প্রথম পত্নীভাবে দেবীকে সম্বোধন করিলেন, "হে দেবী! তুমি সাবিত্রী," মাধুর্য্য-পূর্ণ পত্নীভাব, সম্পৎকালেই সম্ভব, তাহা-তেই মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবান্তর করিয়া বলিলেন, "ত্বং দেবী জননী পরা" তখন ব্রহ্মা প্রকৃত পথ ধরিলেন, ব্রহ্মা, মা মা বলিয়া আকুল হইলেন;—

তিনি বলিলেন,—

"দেবি! এজগৎ তুমি ধারণ করিয়াছ,

তুমিই জগতের সৃজন ও পালন করিতেছ, এবং অন্তে তুমিই জগৎকে গ্রাস করিয়া থাক। অর্থাৎ জগৎ তোমাতে প্রলীন হইবে। তুমি সর্গকালে সৃষ্টিরূপা পালনে স্থিতিরূপা ও প্রলয়ে সংহৃতিরূপা, তুমি মহাবিদ্যা (জ্ঞান স্বরূপা) ও তুমি মহামায়া (আবরণী শক্তি) তুমি মহাস্মৃতি, মহামোহা এবং মহাসুরী ”

ব্রহ্মা আকুল ভাবে এইরূপ স্তুতি করিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন মা! তুমি সৃষ্টিরূপা, কিন্তু তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা সন্তান ব্রহ্মা কেন মা অকালে অসুর হস্তে নিহত হইবে? তুমি স্থিতিরূপা, কিন্তু অসুরদ্বয় বাঁচিয়া থাকিলে, জগতের স্থিতির সম্ভাবনা কোথায়? তবে কি মা তুমি আজ প্রকৃতই সংহৃতিরূপা! সৃষ্টির পর ত সংহার, এখনও যে সৃষ্টিই হয় নাই। মা মহাবিদ্যা! কেন মা! যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুর বিদ্যা (জ্ঞান) আবৃত করিয়াছ? মা তুমি মহামায়া, একি তোমার মায়া? আজ তুমি কি এই মায়ামন্ত্রে অসুরদ্বয় সৃজন করিয়া, মায়াসূত্র বদ্ধ ব্রহ্মার প্রাণহরণে উদ্যতা? মা মহাস্মৃতি। এখনও কি জগতের স্মৃতি জাগরিত হয় নাই? তাহা হইলে কি সৃষ্টি প্রারম্ভেই অসুরদ্বয় সৃষ্টিকর্ত্তার নাশে উদ্যত হইতে পারে? মা তুমি মহাদেবী, তোমার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহাক্রীড়ার মর্ম্ম কে বুঝিবে মা? আমরা অজ্ঞান সন্তান, তোমার লীলা বুঝিনা বলিয়াই, সূত্র বদ্ধ পুতুলের ন্যায় তোমার অঙ্গুলী সঙ্কেতে পরিচালিত হইতেছি। তবে বুঝিলাম-যথার্থই তুমি মহামোহা। এইরূপ মহামোহে ফেলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে ঘুরাইতেছ। মহাসুরি এই কি তোমার আসুরী শক্তি প্রকটনের প্রকৃত সময়? ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়ার জগৎ কর্ত্তৃত্বাদির উল্লেখে স্তব করিতেছেন, এদিকে অসুরদ্বয় ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী; অমনি অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত—

“খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণ ভূশুণ্ডী পরিঘায়ুধা” ॥

হে দেবি তুমি খড়্গিনী, শূলিনী, গদিনী, চক্রিনী। বলিয়া অস্ত্রশস্ত্র বিভূষিতারূপে জগজ্জননীর স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এই স্তুতিতেও ফলোদয় হইল না; পরিশেষে ব্রহ্মা, নিরুপায় হইয়া, কম্পিত কলেবরে বলিয়া উঠিলেন, “যে কোনও স্থানে সৎ অসৎ যে কোনও বস্তু আছে, হে সর্ব্বাত্মিকে! তাহাদের যে শক্তি তাহা এক মাত্র তুমিই, অতএব তোমাকে আর কি স্তব করিব”? এই বার ব্রহ্মা আসল কথাটা বলিয়া ফেলিলেন; সমষ্টিভাবে স্তব করিলেন, এই বারের ডাকই তাঁহার সিংহাসন নড়াইল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিষ্ণুর চক্ষুঃ, মুখ, নাসিকা, হস্ত, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলেন, আজ ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বের সার্থক হইল। মধুকৈটভ! তোমরা ব্রহ্মার অপকার করিতে গিয়া কি উপকারই করিয়া ফেলিলে! আহা যাঁহারা মায়ের সুসন্তান—তাঁহাদের বিপদও সম্পৎ, এবং বিষয়ও অমৃতরূপে পরিণত হয়। তাহার পর যোগনিদ্রাবিমুক্ত মহাবিষ্ণু, জাগরিত হইয়া মধুকৈটভের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন মহামায়ার মায়ামোহে বিমোহিত অসুরদ্বয় রণগর্ব্বে ভগবান্‌কে বলিয়া উঠিল; আমরা তোমার যুদ্ধে সন্তোষ লাভ করিয়াছি তুমি বর প্রার্থনা কর; তখন হরি বলিলেন আর কি বর চাহিব — তোমরা আমার বধ্য হও ধূর্ত্ত অসুরগণ দেখিল জগৎ জলে পরিপূর্ণ, তিল মাত্রও স্থল নাই, তখন বঞ্চনা করিয়া বলিল যেখানে জল নাই, তথায় আমাদিগকে বধ কর। মহাবিষ্ণু ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বকীয় জঙ্ঘদেশে রাখিয়া তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। বলাবাহুল্য এই মধুকৈটভের দেহ মেদ হইতেই জল মধ্যে মেদিনীর পূর্ব্ব সূচনা।

ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্য সাঙ্খ্যতীর্থ
অধ্যাপক শ্রীহট্ট সারস্বত আশ্রম

সামাজিক প্রসঙ্গ।

এই প্রসঙ্গে সামাজিকগণের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাহার উত্তর দেওয়া হইবে। বর্ত্তমান মাসে আমরা এইরূপ কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি, পত্রের সহিত উত্তর নিম্নে লিখিত হইল।

১। বহুবিনয় পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আমাদের এখানে একটী গুরুতর বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনা হইতেছে। কিন্তু কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। নিম্নে বিষয়টী আনুপূর্ব্বিক বিবৃত হইতেছে; আশাকরি দয়া প্রকাশে যথাযথ উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

"দাসজাতীয় একটী লোক একটী মালী স্ত্রীলোককে নিয়া প্রথমতঃ পলাইয়া যায়। তৎপরে অনুসন্ধানে জানা গেল, উহারা প্রথমে শূদ্রজাতীয় এক বৈষ্ণবের নিকট হইতে ভেক্‌গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু স্ত্রীলোকটী মালী বলিয়া তিনি ভেকদিতে সম্মত হন নাই। শেষে মালীজাতীয় এক বৈষ্ণবের নিকট হইতে তাহারা ভেক্ গ্রহণ করে। ভেক গ্রহণের আন্দাজ দেড়মাস কি দুইমাস পরে তাহারা দেশে ফিরিয়া আসে। উক্ত দেড় মাস কি দুইমাস কাল উহারা স্ত্রী স্বামী ভাবে একত্র বসবাস করিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়; এবং স্ত্রীলোকটীও বলে। দাসজাতীয় লোকটী কিছুদিন পরে ভেক পরিত্যাগ করিয়া সমাজে উঠিতে যত্নবান হয়। শাস্ত্রানুসারে সে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারে কি না? উহাই আমরা জানিতে চাহিতেছি।

এদেশে দাসজাতীয় লোক শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মালীজাতীয় লোকের ব্যবসা পাল্কীবহন, মৎস্যধরা ও মৎস্যবিক্রয় ও কোদালী কাজকরা ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় মালীজাতী অন্ত্যজ কিনা তাহাও জানিতে বাসনা রহিল। ইতি—

উত্তর—

দাশজাতি (দাসজাতি) শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইলেও "দাশং নৌকর্ম্মজীবিনং কৈবর্ত্ত ইতি যংপ্রাহুঃ" এই মনুবচনে এবং "কৈবর্ত্ত— মেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতেচান্ত্যজাঃস্মৃতাঃ" এই বিবেকাদিধৃত স্মৃতিবচনের একবাক্যতা করিলে বুঝা যায়, দাশজাতি অন্ত্যজ, মালীও অন্ত্যজ। ব্যাসসংহিতাতে এই মালীই 'মালাকার কুটুম্বী' শব্দে উল্লিখিত। "মালাকারকুটুম্বিনঃ এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতাঃ"। এস্থলে উভয় অন্ত্যজজাতির সংসর্গ হওয়াতে অব্যবহার্য্যতা হইবে না। প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্যতা হইবে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিকব্রত। পারদার্য্য উপপাতক হইলেও আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—

"সবর্ণায়ামনন্যপূর্ব্বায়াং সকৃৎ সন্নিপাতে পাদঃ পতত্যুপদিশতি এই বচনের অর্থে শূলপাণি লিখিয়াছেন,—সকৃদ্গমনে ত্রৈবার্ষিকংচতুর্থে সম্পূর্ণংদ্বাদশবার্ষিকং—ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে। অনিয়তবার অন্ত্যজা গমনে অন্ত্যজেরও ঐ ব্রত। "অভ্যাসেতুতয়ো ভূয়স্ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ" এই মনুবচনে উপপাতক বাহুল্যে প্রায়শ্চিত্তাধিক্য দেখিতেছি। এই আধিক্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রতপর্য্যন্ত, তাহা আপস্তম্ববচনে পাইয়াছি, সুতরাং এরূপ স্থানে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতই কর্ত্তব্য—তৎপরে ব্যবহার্য্যতা হইবে, ইতি

স্বাক্ষর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

২। ব্রাহ্মণসভাগ্রে সানুনয়নিবেদন মেতৎ প্রত্যেক পঞ্জিকায় লিখিত আছে, সত্য

ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে যথাক্রমে মানবের আয়ু, একলক্ষ, দশহাজার, একহাজার ও একশত বিশ বৎসর দেখা যায়, ইহা কোন পুস্তকের প্রমাণ সিদ্ধ। সপ্রমাণ তাহার নাম পাইবার প্রয়োজন। মনুসংহিতায় লিখিত দেখা যায়; চারিশত বৎসর, ক্রমশঃ পাদ পাদ হানি। কুল্লুক ভট্টের ব্যাখ্যায় দেখাযায়, ষোড়শ শতবৎসর পরমায়ুঃ ছিল। সপ্রমাণ মীমাংসা পাইতে বাসনা।

নিঃ শ্রীকালীকুমার শর্ম্ম স্মৃতিরত্ন।

সত্যাদিযুগে লক্ষাদি বর্ষ পরমায়ুর কথা স্পষ্টভাবে কোন প্রামাণিক পুরাণে উল্লিখিত নাই। তবে মেরুতন্ত্র নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি আছে, আমি মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে। শুনিয়াছিলাম। মেরুতন্ত্র আমার নিকট নাই, শ্লোক কয়টী এইরূপ।

সুবর্ণ ভাজনাঃ সর্ব্বে পূর্ণ ধর্ম্ম তপোরতাঃ।
লক্ষবর্ষায়ুষো মর্ত্যাঃ দ্বীন্দুহস্তায়তাঃকৃতে॥*
রৌপ্যপাত্রাশ্চ পাদোনধর্ম্মানো জ্ঞানতৎপরাঃ।
অযুতাব্দায়ুষশ্চাতুর্দ্দশহস্তা নরাস্ত্রেতঃ॥
তাম্রপাত্রার্দ্ধধর্ম্মাণো যাজ্ঞিকা রজসোহর্দ্দিতাঃ।
সহস্রাব্দায়ুষঃসাপ্তহস্তা দ্বাপর সম্ভবাঃ॥
দানৈকধর্ম্ম চরণাস্তামসা প্রায়শো নরাঃ।
শতবর্ষায়ুষঃ কেচিৎ সার্দ্ধত্রিহস্তকাঃ কলৌ॥

দশবর্ষ সহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ অথবা "দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ রামো রাজ্যং করিষ্যতি।"

রামায়ণ আদি১ম সর্গ।

কালিদাসের
"কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদাময়ুতং যযৌ॥

এই দুইটী প্রাচীন প্রসিদ্ধপ্রমাণে ত্রেতাযুগের দশসহস্র বৎসর আয়ুসমর্থিত হইতেছে। মনুর কথাত আপনার বিদিতই আছে।

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ১০ম অধ্যায়ে আছে।
চত্বারি ভারতেবর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যঞ্চ কুরুবর্দ্ধন।
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম
আয়ুঃ সংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম।
তথাত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়াং মনুজাধিপ।
দ্বেসহস্র দ্বাপরে তু ভুবিতিষ্ঠন্তি সাম্প্রতং।
ন প্রমাণ স্থিতি র্হ্যস্তি তিষ্যেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ!
গর্ভস্থাশ্চ ম্রিয়ন্তে চ তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ॥

এই সকল বিভিন্ন প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে কুল্লুকভট্টের মীমাংসাই সমীচীন মনে হয়—

"চতুর্ব্বর্ষ শতায়ুষ্ট্বঞ্চ স্বাভাবিকং অধিকায়ুঃ—
প্রাপক ধর্ম্মবশাদধিকায়ুষোঽপি ভবন্তি॥"

৩। যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয় এখানে একটী ব্যবস্থায় সংদেহ হওয়ায় সেবিষয়ে আপনাদের মতামতজানিতে এই পত্রখানি লিখিতেছি। বিষয়টী এই—

বৃষোৎসর্গের ন্যায় নিজে কিম্বা প্রতিনিধি দ্বারা স্ত্রী ও শূদ্রগণ শালগ্রাম শিলা দান করিতে পারে কিনা? এটী মহদান বলিয়া অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে অকালাদি হইলেও উহা দান করাযায় কিনা? অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কালাশুদ্ধি থাকিলে উহা দান করা যায় কিনা? ইহার যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা সংলগ্নকার্ডে লিখিয়া জানাইলেন, অনুগৃহীত হইব। নিবেদনমিতি

শ্রীতারকেশ্বর স্মৃতিরত্ন

উত্তর

স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রতিনিধিদ্বারা শালগ্রাম শিলা দান করিতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতিগ্রহের নিষেধ আছে। অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে কালাশুদ্ধি থাকিলে কাম্যকর্ম্ম বলিয়া করা যায় না।

* এখানে অঙ্কস্য বামাগতিঃ ইহার ব্যতিক্রম আছে বোধ হয়, ২১ হস্ত অর্থই বোধ হয়। কেননা তৎপরে চতুর্দ্দশ হস্ত ও সপ্তহস্ত আছে।

সংবাদ প্রসঙ্গ।

(১)

বাউগ্রাম শাখা ব্রাহ্মণসভা॥

গত ১১ই বৈশাখ—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বাউগ্রামে একটী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার শাখা সভা স্থাপন করা হইয়াছে। বাউগ্রাম বিপ্রশেখর, কুলশেখর, আকুন্দী, সলকা যুগসরা, শ্রীহট্টি, সমতরী, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, বেলগ্রাম, ছোটকাপশা, অমৃতমণি, বিচুর, গড্ডা, মেজেড়া, কলেশ্বর, প্রভৃতি ১৬ খানি গ্রামের বিপ্রবর্গ উপস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহে শাখা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সভা বাউগ্রামে স্থাপিত হইয়াছে—কারণ উহা ঐ সকল গ্রামের কেন্দ্রস্থলে।

বাউগ্রাম শাখা সভার সহকারী সভাপতিগণ

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
২। শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য
৩। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়
৪। শ্রীযুক্ত কালীচরণ মুখোপাধ্যায়
৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নায়ক।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

দেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ ব্রাহ্মণ্য রক্ষার জন্য চেষ্টা দেখিয়া মনে হয় সুদূর ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার ভারতে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

(২)

পাঁচথুপী ব্রাহ্মণসভা।

গত ১৯শে বৈশাখ রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন পাঁচথুপীগ্রামে একটী শাখা ব্রাহ্মণসভা স্থাপিত হইয়াছে। মালিয়াজী মামুদপুর, গড্ডা, সিংহারী, হরিশ্চন্দ্রপুর, মুনিয়াডিহি, বালুট, বল্লভপুর, নন্দীবানেশ্বর, সাবলপুর, সাটীতরা, আলুটা ও টগরা এই ১৩ খানি গ্রামের বহু ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সভার স্থায়ী সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

সভাপতি ৺ব্রহ্মণ্যদেব।

সহ—সভাপতিগণ—

১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত রামস্মরণ মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীযুক্ত রাধিকাচরণ ভট্টাচার্য্য।
৪। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৬। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম অধিকারী।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সহ—কর্ম্মাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী।

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহ—কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃত পণ্ডিতের তিরোধান।

স্বনামখ্যাত স্মার্ত্তপ্রবর বর্ত্তমানকালের ঋষিকল্প গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিগত ২৬শে চৈত্র ৺কাশীধামে স্বীয় তপঃসাধন পবিত্র পার্থিব শরীর লোকলোচনের অগো-

চরে রক্ষা করিয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই তিরোধানে বর্ণাশ্রমি-সমাজে যে অভাব উপস্থিত হইল, বর্ত্তমান সময়ে সে অভাবের পূরণ সুদূরপরাহত। ইহাঁর জন্ম হইতে এই তনুত্যাগের কাল পরিমাণ ৬৫ বৎসর, জন্মস্থান ফ'রদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুরগ্রাম, এই পূত জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চরিত্র সমালোচনা করিলে অনেক সময়ে ঋষি চরিত্রের স্ফুরণই উপলব্ধি হয়, এজন্য বারান্তরে আমরা উক্ত মহাত্মার জীবন-চরিত্র পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিতে চেষ্টা পাইব।

বরপাত্র প্রসঙ্গ।

শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় বহুতর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই দুই বৎসর যাবৎ প্রতি সমাজের সামাজিকগণের নিকট হইতে বংশপরিচয় সংগ্রহ করা হইতেছে। অথচ তাহার দ্বারা কি হইতেছে না হইতেছে—তাহা কেহই এযাবৎ জানিতে পারেন নাই—তাই সামাজিকগণের উৎকণ্ঠানিবৃত্তির জন্য সংগৃহীত কুল পরিচয় হইতে প্রকৃত কার্য্যারম্ভের সূচনা স্বরূপ রাঢ়ি বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীস্থ পাত্রের সংবাদ প্রতি মাসে এই ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকায় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য রূপে নির্দ্ধারিত হওয়ায় এই নূতন বৎসরের প্রথম মাস হইতে ক্রমশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল, ২৮ শটী জেলাবাসী প্রায় তের চৌদ্দ লক্ষ ব্রাহ্মণের কুলপরিচয় সংগ্রহ করা বহু ব্যয় সাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ৺ব্রাহ্মণ্য দেবের কৃপায় সংগ্রহ কার্য্য মন্দ চলিতেছেনা, কিন্তু অধিকাংশ সংগৃহীত না হইলে ইতিহাস বা কুলগ্রন্থপ্রণয়নে হস্তক্ষেপ করা যায় না অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, সুতরাং সে কার্য্যে আরও কিছু দিন বিলম্ব সম্ভাবনাবশতঃ সামাজিকবর্গের আশা বর্দ্ধনার্থ এই মাস হইতেই কার্য্যসূচনা আরম্ভ করা হইল। কোন পাত্রের সমগ্র বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে ব্রাহ্মণ সভায় পত্র লিখিতে হইবে। পত্রের সহিত টিকিট থাকা আবশ্যক, নচেৎ সে পত্রের উত্তর দেওয়া হইবে না।

রাঢ়ীয় শ্রেণী

ফুলে—নৈকষ্য। ১নং দুইটী ও৫১ও ৫৩ নং তিনটী ভালপাত্র আছে বয়ঃ প্রথম দুইটীর ২১ ও ১৯ বৎসর। শেষ তিনটীর ১৬, ১৭ পর্য্যন্ত। প্রথম নম্বরের শিক্ষা ভাল। শেষোক্তেরটী মধ্যম।

ফুলে ভঙ্গ।

১৯নং, ৩৯নং ও ৪১ নং দুইটী মোট চারিটি পাত্র আছে। শিক্ষা সকলের মধ্যম। বয়স সকলের ১৮ বৎসরের মধ্যে।

খড়দহ নৈকষ্য।

২৮ নং একটি ভালপাত্র আছে। শিক্ষা মধ্যম,উপস্থিত চাকুরী করে বয়স ২২ বৎসর।

খড়দহ ভঙ্গ।

৬ নং ৭ নং ১৬ নং ২৪ নং ২৬ নং তিনটি ৩০ নং ৪৭ নং ৪৮ নং ২টি ৫০ নং একটি মোট ১২ টী পাত্র আছে। সকলের শিক্ষা ভাল, কেহকেহ ইহার মধ্যে চাকুরী করেন। বয়স সকলের ২৭ বৎসর হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে।

খড়দহ বংশজ।

৪৬ নং দুইটি ভাল পাত্র আছে। প্রথমটির শিক্ষা খুবভাল, অপরটী মধ্যম, বয়স প্রথমটির ২২শ ও দ্বিতীয়টির ১৭ বৎসর।

সর্ব্বানন্দী নৈকষ্য।

১ নং দুইটি পাত্র, শিক্ষা খুবভাল, ১টি প্রেসিডেন্সীকলেজেপড়ে ও অপরটি বঙ্গবাসী-কলেজে পড়ে বয়স একটির ২১ ও অপরটীর ১৯ বৎসর।

সর্ব্বানন্দী ভঙ্গ।

৩নং ও ৪০ নং দুইটি পাত্র আছে। শিক্ষা মধ্যম, একটির বয়স ২০ অপরটির ১৯ বৎসর।

সর্ব্বানন্দী বংশজ।

৪৪ নং পাত্র, শিক্ষা মধ্যম, বয়স ১৯বৎসর।

সুরাই মেল।

৪২ নং দুইটি পাত্র, ডাক্তারী পড়ে ২৫ ও ২৩ বৎসর বয়স। আরও দুইটি নম্বর হীন পাত্র আছে বয়স ২০, ১৮ বৎসর, শিক্ষা এক রকম।

কলিকাতা ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে
ব্রাহ্মণসমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৯নং রাজকৃষ্ণ বসুর লেনস্থ জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

বিতরণ।

(,

মদীয় পিতৃদেব সুগৃহীতনামা কবিবর—

৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রণীত।

পুস্তকগুলি প্রচারার্থ কেবল প্রেরণাদিবার আট আনা অথবা ঐ মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাইলেই বিতরণ করিব।

এই পুস্তকগুলি পূর্ব্বে ৩৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। পুস্তক—

১। ভগবচ্ছতকং (ভারতীয় নানাস্থানের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।

২। কাব্যপেটিকা ১ম ও ২য় ভাগ।

৩। রসকাদম্বিনী। (অমরু শতকের পদ্য বঙ্গানুবাদ)।

৪। ধীরানন্দ তরঙ্গিণী।

(মদীয় ৺প্রপিতামহ দেব প্রণীত চম্পূকাব্য, ৺পিতৃদেব কৃত সমালোচনা ও টীকা সহ)।

শ্রীসারদাচন্দ্র কবিভূষণ। রাজারামপুর। (দিনাজপুর)

ব্রেইন BRAIN OIL অইল।

ফ্লোরা Flora Phosphorine ফস্‌ফরিন্‌।

ডাঃ চন্দ্রশেখরকালী আবিষ্কৃত।
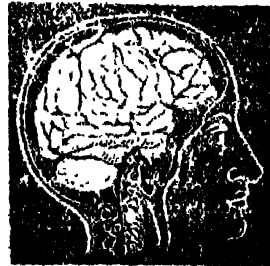
মস্তিষ্কজনিত পীড়াচয়, স্মৃতিহীনতা, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, ধাতুদৌর্ব্বল্য এবং কোষ্ঠবদ্ধাদির মহৌষধ; ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, ইঞ্জিনিয়ারাদির নবজীবনপ্রদ।

শিশি ১৲ এক টাকা। ডজন ৯৲ টাকা।

C. Kylye & Co. 150, Cornwallis Streetr Calcuttt